পক্ষীরাজ ও উর্বশী

দেবকুমার বসু

পক্ষীরাজ ও উর্বশী

[রেসিং ওয়ার্লডের পটভূমিতে লেখা প্রথম উপন্যাস]

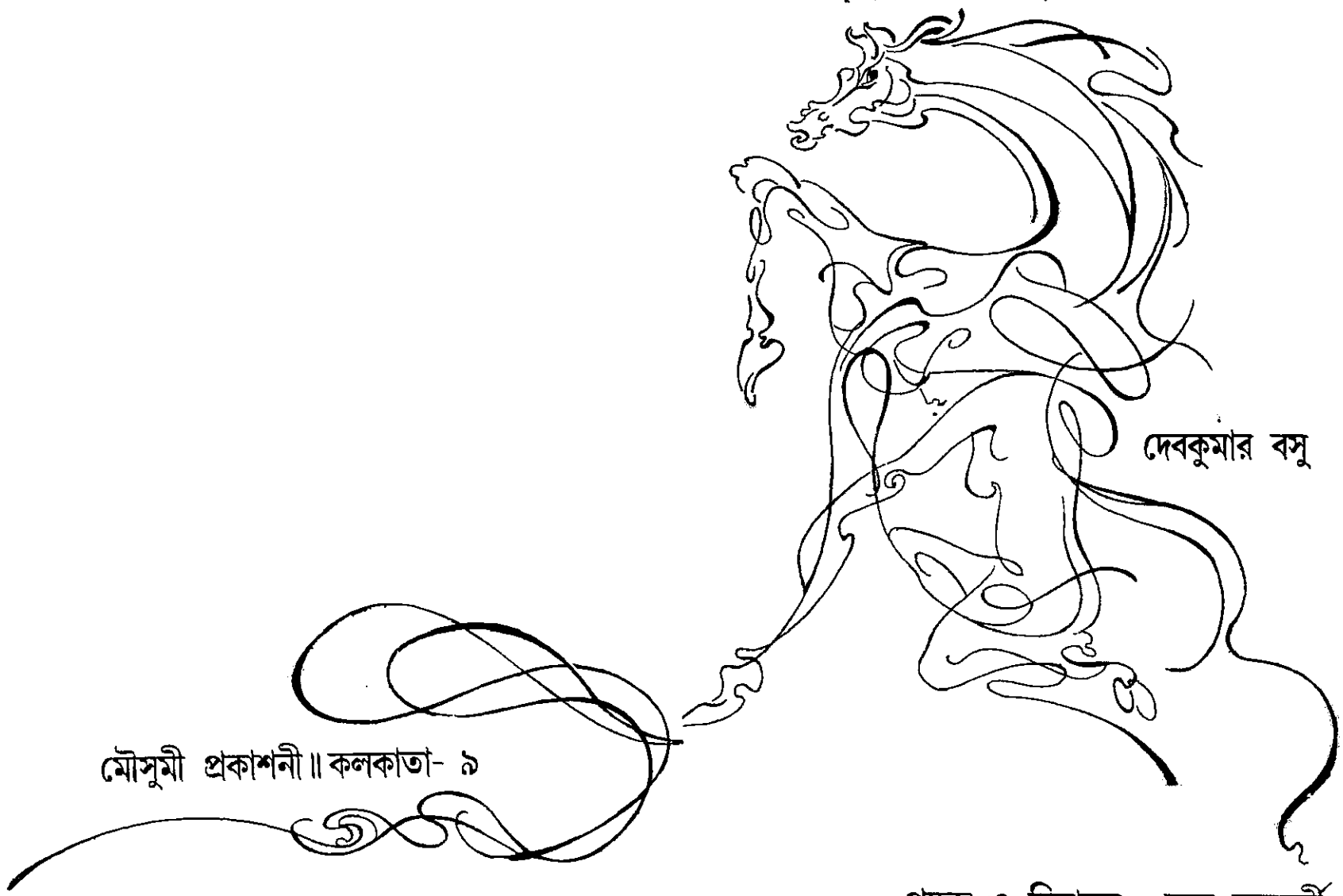

দেবকুমার বসু

মৌসুমী প্রকাশনী ॥ কলকাতা- ৯

প্রচ্ছদ ও চিত্রাঙ্কন : সত্য চক্রবর্তী

রেসের মাঠে
প্রয়াত সর্বহারা
ও জে. সি. গলস্টোন-এর
স্মৃতির উদ্দেশে —

প্রকাশকাল :
কলকাতা বইমেলা, রজত জয়ন্তী বর্ষ-২০০০

মৌসুমী প্রকাশনী,
১এ কলেজ রো, কলকাতা-৯ থেকে
শ্রীদেবদাস বিশ্বাস কর্তৃক প্রকাশিত
ও দাস অফসেট প্রসেসর, ২৫ গুলু ওস্তাগার লেন,
কলকাতা - ৬ থেকে মুদ্রিত

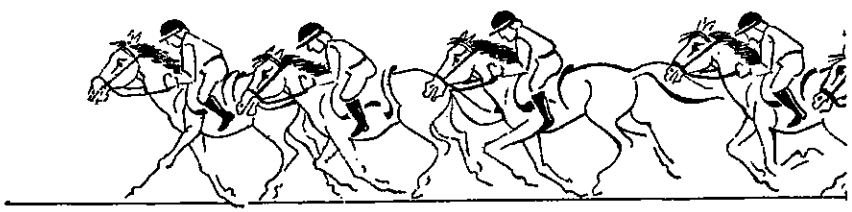

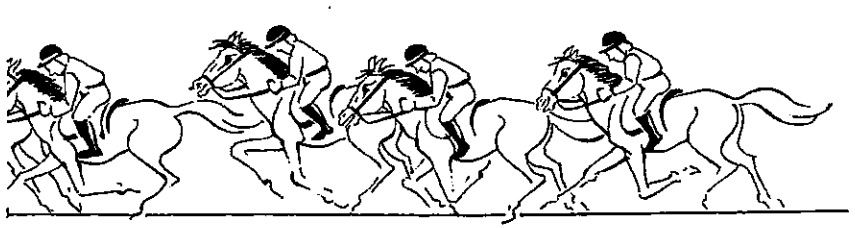

স্বীকারোক্তি

এই উপন্যাসের উপকরণ-সূত্র প্রায় একশো ভাগ সত্য। তবে দু-চারটি বাদে প্রায় সমস্ত চরিত্রই কাল্পনিক। বাস্তব চরিত্রগুলির নাম পরিবর্তন করা হয়নি। যথার্থ নামই ব্যবহার করা হয়েছে।

কিছুদিন আগে সৌভাগ্যক্রমে বাপি (দুলাল) সাহা নামে একজন ব্যক্তির সঙ্গে পরিচয় হয়। 'সৌভাগ্যক্রমে' বলছি এই কারণে, তাঁর সঙ্গে আলাপ না হলে আমার অভিজ্ঞতার একটি দিক চিরদিনের মতন অন্ধকারেই থেকে যেত। একদিন বাপির সঙ্গে সান্ধ্যকালীন আড্ডায় মিলিত হই। হালকা অনুপানের সঙ্গে যে-বিষয়ে কথা হচ্ছিল, তার নাড়ীনক্ষত্র কিছুই আমি জানি না। কথা হচ্ছিল ঘোড়দৌড় নিয়ে। আমি জীবনে কোনওদিন রেসের মাঠে যাইনি। রেস সম্পর্কে আমার কোনও ধারণাই নেই। অতএব আমি ছিলাম শুধুই শ্রোতা।

রেসের মাঠের গল্প শুনতে শুনতে আমি রীতিমতো বিভোর হয়ে যাই। রেসিং ওয়ার্ল্ডের অন্তরালে ঘোড়া নারী সুরা ও মাফিয়াদের কাহিনী শুনতে শুনতে আমার রক্ত চঞ্চল হয়ে ওঠে। এবং এই অজানা জগৎটাকে নিয়ে লেখার তাগিদ অনুভব করি।

খুব অল্প সময়ের মধ্যেই আমি বাপির সঙ্গে অতীব ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়ি। নিবিড় বন্ধুত্বের সেতু গড়ে ওঠে আমাদের মধ্যে। আজ বাপি শুধুমাত্র আমার বন্ধুই নন—আমার হৃদয় এখন তাঁর জন্যে ভ্রাতৃত্বের বাৎসল্যে পূর্ণ। পরিণত বয়সের এমন সম্পর্ক আজ আমার কাছে এক বিরল অভিজ্ঞতা।

বাপির সঙ্গে নিয়মিত বসতে শুরু করলাম। দিনের পর দিন চলল নোট নেওয়া। লেখাও শুরু হয়ে গেল একসময়।

'সহস্র এক আরব্য রজনী'-র প্রণেতা ক্ষিতীশ সরকার বরাবরই আমাকে অকৃপণ স্নেহের চোখে দেখেন। তাঁর দেওয়া উৎসাহ এবং বাপির কাছ থেকে রসদ না পেলে এ-বই কোনও দিন লেখা হত না। এই দুজনকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে ছোট করতে পারব না। আমার হৃদয়ে আমৃত্যু এঁরা স্থান করে নিয়েছেন।

১২ সার্কাস রেঞ্জ
কলকাতা-১৯

দেবকুমার বসু
১.১.২০০০

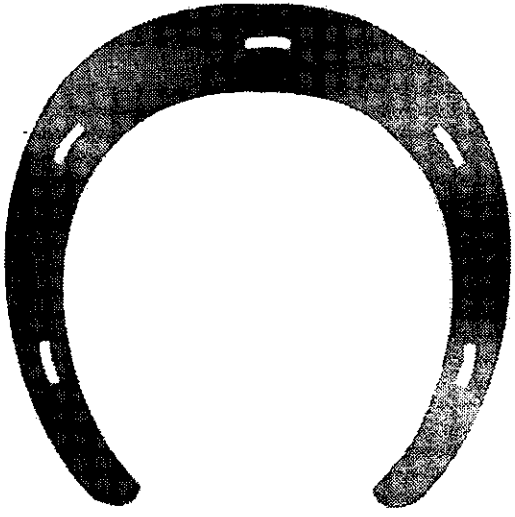

PAKSHIRAJ O URVASI
[A novel based on
the background of racing world]
By DEBKUMAR BASU
Cover and other illustrations : SATYA CHAKRAVARTY
Price : Rs. 100/- only

চতুর্থ রেস শুরু হল। বারোশো মিটার দূরত্বকে কমাতে কমাতে উইনিং পোস্টের লক্ষ্যে দৌড় শুরু করল সাতটি ঘোড়া। সঙ্গে তাদের পিঠে সাতজন জকি—মানুষ। ঘোড়ার পিঠে মানুষ। আমার ফেভারিট 'কুইনি ক্লাসিক' শুরু থেকেই সবাইকে ছাড়িয়ে অন্তত ছ-সাত লেংথ এগিয়ে। এ ঘোড়ার 'উইন' কেউ ঠেকাতে পারবে না। দেখে মনে হচ্ছে, সাতটি নয়—ছটি ঘোড়ার রেস হচ্ছে। 'কুইনি' অনেক আগে রেলিং ঘেঁষে ফাইনাল বেন্ড নিচ্ছে। মনে হচ্ছে সে বুঝি একাই ছুটছে। বাকি ছয়টি ঘোড়া অনেক পিছনে নিজেদের মধ্যে রেষারেষি করছে। কিন্তু একি—! 'কুইনি'র কী হল! ও তো গ্যালপ করছে না! আর মাত্র দুশো মিটার বাকি। অবিশ্বাস্য—! 'কুইনি'-কে টপকে 'মাউন্টেন টাচ' উইন করে গেল। 'কুইনি' সেকেন্ড! গট আপ, গট আপ!

পুরো গ্যালারিতে মুহূর্তে ঝড় উঠল। চিৎকার চেঁচামেচি ধাক্কাধাক্কি আগুন। কমেন্টেটরের ঘোষণা শোনা গেল : 'কুইনি'-র জকি কাদের আখতার আপত্তি জানানোয় স্টুয়ার্ডস্ এনকোয়্যারি হচ্ছে। ফল স্থগিত রাখা হয়েছে—শীতের দুপুর শুষে নেয় কমেন্টেটরের ভয়েস।

অবস্থা সামলাতে মাউন্টেড পুলিশ উঠে পড়ে গ্যালারির প্যাসেজে। শুরু হয় লাঠি চার্জ। ছুটে সবাই উঠে পড়ছে গ্যালারির উপর দিকে। প্যাসেজ এড়িয়ে একটার পর একটা বেঞ্চ হার্ডল করে সবাই উপরের দিকে ছুটছে। মাঝপথেই পড়ে যাচ্ছে অনেকে। তাদের মাড়িয়েই উপরে উঠে যাচ্ছে জনসমুদ্র। পিছনের সিঁড়ি বেয়ে স্রোতের মতো মানুষ নেমে আসছে গ্যালারির পিছনে।

প্লাবনে ভেসে যাওয়া এক টুকরো কাঠের মতন বিধ্বস্ত আমি নিজেকে আবিষ্কার করলাম গ্যালারিতে একটা বেঞ্চের নিচে। ততক্ষণে ঝড় থেমে এসেছে। বহু মানুষ চারদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে গিয়েছে। গ্যালারির পিছনের প্রাঙ্গণে কাতারে কাতারে মানুষ ধর্না দিয়ে বসে আছে। আমি বেঞ্চের

নিচে থেকে বেরিয়ে সিঁড়ি বেয়ে গ্যালারির পিছনে নেমে গেলাম।

আজ 'কুইনি'-র দর ছিল 'ইভ্‌ন' মানি। পঞ্চাশ হাজার টাকা লাগিয়েছিলাম উইনে, পঞ্চাশ হাজার প্লেসে। প্লেসের দরে যা ফেরৎ পাব, সেটা এক লাখের কাছে কিছুটা সান্ত্বনা। মাথা দপ্‌দপ্‌ করছিল। গত সপ্তাহে একটা লরি বিক্রি করে দিয়েছি। আঠারোটা লরি ছিল আমার। এখন পনেরোয় এসে ঠেকেছে। মাইকে ঘোষণা করল : 'মাউন্টেন টাচ' প্রথম, 'কুইনি' দ্বিতীয়। এটাই হল স্টুয়ার্ডের ফাইনাল সিদ্ধান্ত। 'ওয়ে-ইন-রুমে' ঘোড়ার লালা, ঘাম এবং স্যাড্‌ল-এর ওজন পরীক্ষা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। অতএব, গট লস্ট!

ঠিক করলাম, আজ আর খেলব না। মেজাজ বিগড়ে গিয়েছে। পেমেন্ট নিয়ে বেরুতে যাব, ইভিনার সঙ্গে দেখা। মনে হল, এই মুহূর্তে ইভিনার চেয়ে বড় সান্ত্বনা আর কী-ই বা হতে পারে! দ্রুত এগিয়ে গিয়ে ইভিনার একটা হাত জড়িয়ে ধরি। আক্ষেপ করে বললাম, 'ইভিনা, সর্বনাশ হয়ে গেল আজ, প্রায় ত্রিশ হাজার—'

হাত ছাড়িয়ে নিল ইভিনা। বলল, 'এটা নতুন আর কি! যত টাকা তুমি রেসের মাঠে ঢেলেছ, তার তুলনায় এটা নস্যি। বিশ হাজার টাকা ধার চেয়েছিলাম, কোনও পাত্তাই দাও নি। অথচ সিনেমার তক্‌মাধারী নায়িকা চিত্রার সঙ্গে একরাত কাটিয়ে তাকে দশ হাজার টাকা দিয়েছ। তুমি ভাব, আমি কিছুই খবর রাখি না!'

এই মুহূর্তে মানসিকভাবে আমি এতটাই ভেঙে পড়েছি, যা কাউকে বোঝানো যাবে না, আমি সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত। কিছু মদ এবং নারীসঙ্গই আমাকে সাময়িক শান্তি দিতে পারে। এই দুটোর সান্নিধ্যেই আমি একটু থিতু হতে পারব। আমি ইভিনার ঘন সান্নিধ্যে সরে এসে বললাম, 'পাবে তুমি ইভিনা, ধার নয়, তোমাকে এমনিই দেব। এখন চলো, এখান থেকে বেরুনো যাক।'

একরকম জোর করেই ওকে টেনে নিয়ে গেলাম গাড়ির দিকে। গণ্ডগোলের জন্য বাকি রেসগুলো বাতিল হয়ে গেল।

কারনানি এস্টেটে ইভিনার এক কামরার সাজানো অ্যাপার্টমেন্ট। ফ্রিজ, রঙিন টিভি, ভি-সি-পি, আধুনিক মিউজিক সিস্টেম, অডিও-ভিডিও ক্যাসেট,

একরকম জোর করেই ওকে টেনে নিয়ে গেলাম গাড়ির দিকে

ব্লু-ফিল্মের ক্যাসেট, মদের সেলার—সব কিছুই আছে ইভিনার হেপাজতে। ইভিনা সুন্দরী, উদ্ধত স্বাস্থ্যবতী, সোনালি গায়ের রঙ—এক আধুনিকা দেহোপজীবিনী। একজন হতাশ ধনী পুরুষের ধমনীতে কামনার বিষ ইনজেক্ট করে কীভাবে তাকে স্বতঃস্ফূর্ত করে তুলতে হয়—সেটা ইভিনা খুব ভালো করেই জানে।

মদের সঙ্গে নিজেকে উজাড় করে দিল ইভিনা। আমি বিশ হাজারের স্টেক রাখলাম ওর নাকের ডগায়। 'কুইনি ক্লাসিক'-কে দিয়ে এলাম ত্রিশ হাজার। সে তো একটা মাদী ঘোড়া, মাদী মানুষটার জন্যে বিশ হাজার দেব না! এই মুহূর্তে ও তো আমাকে প্রায় 'ডারবি' জেতার আনন্দ দিচ্ছে।

'ডারবি' জিতে 'কুইনি' হারানোর শোকে কিছুটা প্রলেপ পড়ল। বিশ হাজার পেয়ে ইভিনা আমাকে দশ দিনের ফ্রি এনট্রি অফার করল। রাতে আমি আমার জোড়া বউ-এর কাছে ফিরে গেলাম বালিগঞ্জ প্লেসে।

সকালে লিকার চা খেতে খেতে কাগজে চোখ বোলাচ্ছি। ঘোড়ার খবরটাই আসলে খুঁটিয়ে দেখার জন্যে তিন-চার রকমের কাগজ আনাই। কিন্তু মাথা খাটিয়ে হাজারো ক্যালকুলেশন করেও শিওর ঘোড়াতে বাজি লাগিয়েও হেরে যেতে হচ্ছে। সব শালা গট্ আপ! একটা খবর দেখে চমকে উঠলাম। 'জকির মৃতদেহ লেকে'। দ্রুত খবরটা পড়ে ফেললাম। স্তম্ভিত হয়ে বসে রইলাম চুপচাপ।

'হিয়া' বউ এসে অফিস যাবার তাড়া দিল, 'কী হল? বোমভোলার মতন বসে বসে কী ভাবছ? নিশ্চয়ই মাথায় ঘোড়া ঢুকে বসে আছে? ওঠো। তোমার কিন্তু অফিসের দেরি হয়ে যাচ্ছে।'

ঠাণ্ডা-গরম জলের প্রবাহ অ্যাডজাস্ট করে শাওয়ারের নিচে দাঁড়ালাম। হঠাৎ মনে হল, জলে ডুবে যাচ্ছি। জকি কাদের আখতারকে ব্যক্তিগত ভাবে চিনতাম। ওর কাছ থেকে অনেক সময় শিওর টিপ্‌স্ পেয়েছি। অনেকগুলো বাজিও জিতেছি। গতকাল রাতেই কাদেরকে খুন করে লেকের জলে ভাসিয়ে দিয়ে গিয়েছে কারা যেন। মনে হচ্ছে ডুবে যাচ্ছি গভীর জলে। শাওয়ারের ধারায় দম নিতে কষ্ট হচ্ছে। তাড়াতাড়ি বন্ধ করে দিলাম।

কাগজের লেখাগুলো চোখের সামনে ভেসে উঠছে। কাল 'কুইনি'র পিঠে জকি ছিল কাদের আখতার। ঘোড়ার পিঠে বাঁধা স্যাড্‌লের বেল্ট ঢিলে হয়ে গিয়েছিল 'কুইনি'-র পিঠে। কাদের ঘোড়াকে গ্যালপ করাতে গেলেই ছিটকে যেত। ফলে চুপচাপ বসে থাকা ছাড়া ওর কিছুই করার ছিল না। 'কুইনি' ছুটছিল, কিন্তু কাদের ওকে গ্যালপ করাতে পারেনি। ফলে 'মাউন্টেন টাচ' ওকে ধরে ফেলে। 'কুইনি' দ্বিতীয় হয়ে যায়। 'ওয়েইন-রুমে' পরীক্ষার সময় কাদের স্টুয়ার্ডকে দেখায় 'কুইনি'-র বুকের নিচে স্যাড্‌লের বেল্টের ফুটো প্রায় এক ইঞ্চি বেড়ে গিয়েছে। এক্ষেত্রে রেস বাতিল করার আবেদন জানায় কাদের। কিন্তু এক্ষেত্রেও যে ব্যাপারটা গট আপ, ইচ্ছাকৃত—সেটা বুঝতে সময় লাগল না ওর। এই বোঝাটাই হল ওর কাল। এটা অবশ্য আমার আন্দাজ।

কেননা কাগজে এত কথা লেখেনি। সংক্ষেপে শুধু লিখেছে : কাদের আখতারের অভিযোগ, স্যাড্‌ল ঢিলে হয়ে যাবার জন্য রেস বাতিল করা হোক। কিন্তু তা করা হয়নি। গভীর রাতে ওর মৃতদেহ উদ্ধার করা হয় লেক থেকে।

অনেক জকির সঙ্গেই আমার ব্যক্তিগত যোগাযোগ ছিল। কাদেরের সঙ্গে ওর বাড়িতেও গিয়েছি কয়েকবার। বাড়ি বলতে ফ্ল্যাট। সার্কাস অ্যাভিন্যুতে। দুজনে একসঙ্গে পান-ভোজন করেছি। ওর বউয়ের সঙ্গে পরিচয় আছে আমার। দুটি বাচ্চা নিয়ে বউটা কী অবস্থায় পড়ল, কে জানে! সময় করে একদিন যেতে হবে।

গতকাল কাদের 'কুইনি'-র জকি ছিল। আজ ও নেই। গতকাল আমি ইভিনার জকি হয়েছিলাম। শাওয়ারের নিচে আজ আমার দম বন্ধ হয়ে আসছিল কেন!

অফিসে পৌঁছে শুনলাম, শর্মিষ্ঠা ফোন করেছিল। মাসখানেক ওর সঙ্গে যোগাযোগ নেই। শর্মিষ্ঠা এখন আমার পাতানো বউ। ওকে প্রথম দেখি রেসের মাঠে। তখন ও সদ্য বিবাহিত। আমার মনে পড়ে যাচ্ছে—কিছুদিন ধরে লক্ষ্য করছিলাম, সদ্য বিবাহিত এক দম্পতি মাঠে আসতে শুরু করেছে।

দুজনেরই স্বাস্থ্য ভালো, রূপ-যৌবনও যথেষ্ট চোখ টানে। বিশেষ করে বধূটি এতোই সুন্দরী—তাকালে চোখ ফেরানো যায় না।

একদিন ভিক্টোরিয়ার পাশ দিয়ে যাবার সময় ওই দম্পতিকে দেখতে পেলাম। গাড়ি থামিয়ে একটু ব্যাক করে ওদের কাছাকাছি এসে থামলাম। চোখাচোখি হতে মৃদু হাসি ফোটালাম চোখে-মুখে। যুবকটিকে বললাম, 'চিনতে পারছেন?'

সে জবাব দেবার আগেই যুবতীটি বলে উঠল, 'আপনাকে রেসের মাঠে দেখেছি না?'

আমি বললাম, 'এগজ্যাক্টলি। আপত্তি না থাকলে উঠে আসুন। এক চক্কর হাওয়া খেয়ে এসে আবার নামিয়ে দেব।'

যুবকটি ঘড়ি দেখল। বলল, 'না, আমাদের এবার ফিরতে হবে।'

জিজ্ঞেস করলাম, 'কোন্‌দিকে যাবেন?'

যুবকটি বলল, 'রাসবিহারি।'

আমি মিথ্যা করে বললাম, 'আরে, উঠে আসুন। আমি ওদিকেই যাব।'

বাঁদিকে সামনের দরজাটা খুলে দিলাম। যুবকটি উঠে এলো আমার পাশে। ওর বাঁদিকে বসল যুবতীটি। আমি গাড়ি ছেড়ে দিয়ে বললাম, 'আমার নাম তড়িৎ সিন্‌হা।'

ডানহাতটা কপালে ঠেকালাম। যুবকটি বলল, 'আমি দেবাশিস দত্ত', পাশে যুবতীটিকে দেখিয়ে বলল, 'আমার স্ত্রী শর্মিষ্ঠা।'

দুজনেই হাতজোড় করে নমস্কার জানাল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'রাসবিহারিতে কোথায় থাকেন?'

দেবাশিস বলল, 'ট্র্যাঙ্গুলার পার্ক।'

গন্তব্যের দিকে যেতে যেতে আমি জানতে চাইলাম, 'রেসের মাঠ কেমন লাগছে?'

দেবাশিস জানাল, 'কলকাতার লাইভ রেস দেখতে দারুণ লাগে।'

আমি শর্মিষ্ঠাকে উদ্দেশ্য করে বললাম, 'আর আপনার?'

শর্মিষ্ঠা বলল, 'আমি রেসের কিছুই বুঝি না। তবে, দেখতে খারাপ লাগে না।'

দেবাশিসকে জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনি নিশ্চয়ই বোঝেন?'

দেবাশিস বলল, 'কিছুটা বুঝি। একজনের গাইডেন্সে পাঁচশো হাজার খেলি। ভবিষ্যতে বাজিমাৎ করার আশা রাখি।'

বললাম, 'আপনাদের দেখে মনে হচ্ছে, নিউলি ম্যারেড। তাই না?'

দেবাশিস বলল, 'হ্যাঁ, তিনমাস হল আমাদের বিয়ে হয়েছে।'

শর্মিষ্ঠা যোগ করল, 'বিয়ের আগে আমরা কেউই রেসের মাঠ দেখি নি। বিয়েতে পাওয়া যৌতুকের টাকাটা ডবল হলেই আমরা মাঠে আসা ছেড়ে দেব।'

শুনে আমি থ! রেসের মাঠে এসেছে টাকা ডবল করতে! ইউনিট ট্রাস্ট, এন-এস-সি থাকতে রেসের মাঠ! আমি বললাম, 'টাকা ডবল করার তো অন্য রাস্তা ছিল। রেসের মাঠে কোনও গ্যারান্টি আছে নাকি?'

শর্মিষ্ঠা বলল, 'ওকে কারা সব বুঝিয়েছে, সার্টিফিকেট কিনলে পাঁচ-ছ বছর লেগে যাবে। রেসের মাঠে এক বাজিতেই টাকাটা ডবল হয়ে যাবে।'

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'কত টাকা ডবল করতে চান?'

শর্মিষ্ঠা বলল, 'আমাদের হাতে তিন লাখ আছে। ওটা ছ লাখ হয়ে গেলেই ও একটা ব্যবসায় নামবে।'

আমি দেবাশিসকে জিজ্ঞেস করলাম, 'এখন কী করেন?'

দেবাশিস বলল, 'একটা কস্‌মেটিক্‌স কোম্পানিতে আছি। টাকাটা পেলে ওই কোম্পানিরই ডিলারশিপ নিয়ে নিতে পারি। ফারমাসিটিক্যাল লাইনেও অভিজ্ঞতা আছে। দেখা যাক্‌, টাকাটা তো আগে পাই।'

আমি বললাম, 'রেসের মাঠে কিন্তু রিস্ক আছে। একটু এদিক-ওদিক হয়ে গেলেই পুরো টাকাটাই চলে যাবে।'

দেবাশিস বলল, 'চট করে তো খেলব না। আগে ভালো করে স্টাডি করি, তারপর বুঝে-শুনে পঞ্চাশ পঞ্চাশ করে খেলব।'

আমি বললাম, 'দেখুন চেষ্টা করে। বেস্ট অফ লাক।'

শর্মিষ্ঠা বলল, 'আমরা এসে গেছি। এবার ডানদিকে।'

আমি ডানদিকে গাড়ি ঘোরালাম। একটি ফ্ল্যাটবাড়ির নিচে ফুটপাথ ঘেঁষে গাড়ি দাঁড় করাতে বলল দেবাশিস। শর্মিষ্ঠা বলল, 'নামুন। একটু

চা খেয়ে যাবেন।'

আমি বললাম, 'আজ থাক। একটু তাড়া আছে। তাছাড়া আমি চা খাই না।'

দেবাশিস বলল, 'এদিকে এলে চলে আসবেন। তিনতলায় ডানদিকের ফ্ল্যাটে আমরা থাকি। মাঠে অবশ্য দেখা হবে। অনেক ধন্যবাদ আপনাকে।'

আমি বললাম, 'মোস্ট ওয়েলকাম। দেখা হবে। বায়।'

আমার গন্তব্য ছিল পার্ক স্ট্রীট। চলে এসেছি পূর্ণ দাস রোডে। শর্মিষ্ঠার টানে টানেই যে বাড়িটা চিনে গেলাম, সেটা নিশ্চয়ই ওরা ধরতে পারে নি।

এরপর তিনমাসের মধ্যে মাত্র দুদিন দেখা হয়েছিল দেবাশিস-শর্মিষ্ঠার সঙ্গে। বিশেষ কথা হয়নি। শর্মিষ্ঠা অনুযোগের সুরে শুধু বলেছিল, 'আপনি কিন্তু এলেন না একদিনও।'

আমি বলেছিলাম, 'ওদিকে গেলে অবশ্যই যাব।'

শর্মিষ্ঠা বলেছিল, 'ওদিকে না গেলে যাবেন না?'

আমি বলেছিলাম, 'ঠিক আছে, যাব একদিন। টাকা কতটা বাড়লো?'

শর্মিষ্ঠা ঠোঁট উল্টে বলেছিল, 'ছাই বেড়েছে! এর মধ্যেই লাখ খানেক চলে গেছে।'

আমি বলেছিলাম, 'সরি, মোস্ট আনফরচুনেট।'

এরপর অনেকদিন আর দেখা হয়নি ওদের সঙ্গে। একদিন অফিস যাবার সময় উল্টো পথ ধরলাম। গড়িয়াহাট গোলপার্ক হয়ে পূর্ণ দাস রোড ধরে সোজা ওদের ফ্ল্যাটে হাজির হলাম। দেখলাম, ফ্ল্যাটে তালা ঝুলছে। ফিরে এলাম অফিসে।

একটা ছুটির দিনে আরও একবার পাড়ি দিলাম ওদের ফ্ল্যাটে। বেল টিপতে দরজা খুললেন যিনি, তাঁকে কোনওদিন দেখিনি। জিজ্ঞেস করলাম, 'দেবাশিস দত্ত—'

ভদ্রলোক বললেন, 'ওঁরা ফ্ল্যাট বিক্রি করে দিয়েছেন।'

জিজ্ঞেস করলাম, 'মাপ করবেন। ওঁদের ঠিকানাটা—'

ভদ্রলোক বললেন, 'যতদূর জানি—সোনারপুর কিংবা সুভাষগ্রাম, ঠিক বলতে পারব না।'

আমি ধন্যবাদ জানিয়ে ফিরে এলাম।

এর মাসখানেক পরে লাইটহাউস সিনেমার সামনে হঠাৎ শর্মিষ্ঠার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। জিজ্ঞেস করলাম, 'কী ব্যাপার! আপনারা ওখানে আর থাকেন না? দুদিন গিয়ে ফিরে এসেছি।'

শর্মিষ্ঠা বলল, 'সময় থাকলে চলুন কোথাও বসি। অনেক ব্যাপার ঘটে গেছে।'

একটা বিপর্যয়ের গন্ধ পেলাম শর্মিষ্ঠার কথায়। ঘড়ি দেখলাম। সাড়ে চারটে বাজে। ওকে নিয়ে চলে এলাম ক্যালকাটা ক্লাবে। একটা কোণে বসলাম ওকে নিয়ে। জিজ্ঞেস করলাম, 'কী খাবেন বলুন।'

ও বলল, 'আপনি কি ড্রিংক করবেন?'

আমি বললাম, 'হ্যাঁ, স্কচ।'

শর্মিষ্ঠা একটু ভাবল। তারপর বলল, 'আগে খেতাম না। এখন মাঝে মাঝে খাচ্ছি। বলুন একটা।'

বোনলেস চিলি চিকেন আর হুইস্কির অর্ডার দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'দেবাশিসবাবুর খবর কি?'

শর্মিষ্ঠা বলল, 'খবর ভালো না। একবার আত্মহত্যার চেষ্টা করে বেঁচে গেছে। সেদিন যদি আপনার কথাটা শুনত!'

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'টাকাটা কি চলে গেছে?'

শর্মিষ্ঠা বলল, 'হ্যাঁ। চাকরিটাও চলে গেছে।'

হুইস্কি এলো। বরফ মিশিয়ে নিঃশব্দে চুমুক দিলাম আমরা। শর্মিষ্ঠা বলল, 'রেসের মাঠে তিন লাখ চলে যাবার পরেও ওর শিক্ষা হয়নি। এমন বাজে লোকের পাল্লায় পড়েছিল—ফ্ল্যাটটা বিক্রি করেও টাকাটা উড়িয়ে দিল রেসের মাঠে। আশা আর লোভ সর্বস্ব কেড়ে নিয়েছে। পাগলের মতন অবস্থায় একদিন ঘুমের বড়ি খায় গুচ্ছের। সময় মতো নার্সিংহোমে না পৌঁছলে কিছু করার ছিল না। বেঁচে গেছে। কিন্তু আত্মহত্যার চেষ্টা করায় চাকরিটা চলে গেছে। এখন সুভাষগ্রামের একটা বস্তিতে থাকি। ওর মাথাটা ঠিক নেই। মাঝে মাঝেই ভুল বকে।'

জিজ্ঞেস করলাম, 'চলছে কি করে?'

শর্মিষ্ঠা নির্বিকার বলে দিল, 'আমার যৌবন বেচে।'

ওর খোলামেলা পোশাক দেখে সেটাই আন্দাজ করেছিলাম। এখন নিশ্চিত হলাম।

ও বলল, 'রেসের মাঠে আপনার সঙ্গে দেখা করার জন্য যাব ভেবেছিলাম। আজ হঠাৎ দেখা হয়ে গেল।'

জিজ্ঞেস করলাম, 'আমি আপনাকে কিভাবে সাহায্য করতে পারি, বলুন।'

শর্মিষ্ঠা বলল, 'আমাকে এখন থেকে আর আপনি-আপনি করবেন না। আমি আপনার দাসী হয়ে থাকতে চাই। দুটো মানুষের দুবেলা চলে যাবার মতন টাকা পেলেই আমি দেহ বিক্রি বন্ধ করব।'

টেবিলে খাবার রেখে গেল বেয়ারা। আমি ওর দিকে প্লেটটা ঠেলে দিয়ে বললাম, 'খাও। আমি আরও হুইস্কি নেব—তুমি নেবে?'

শর্মিষ্ঠা বলল, 'আপনি বললে নেব। আপনি কি আমাকে বরাবরের জন্যে রাখতে পারবেন? আপনি যা বলবেন আমি তা-ই করব।'

বেয়ারাকে ডেকে আরও দুটো হুইস্কি দিতে বললাম। শর্মিষ্ঠার রূপের চটক আছে। স্বাস্থ্যের বাঁধুনিও ঠাসবুনুনি। ওর আকর্ষণেই ওদের বাড়ি অবধি গিয়েছিলাম। এখন ও নিজেকে আমার কাছে সমর্পণ করতে চাইছে। আমি চাইলে যে-কোনও সময় ও নিজেকে নগ্ন করে আমাকে যৌনসুখে তৃপ্ত করবে। কিন্তু আমি ওর দুর্বলতার সুযোগটা নিতে পারলাম না। ওর অসহায় অবস্থার সাক্ষী হয়ে গুটিয়ে গেলাম আমি। অফিসের ঠিকানা আর ফোন নম্বর ছাপা কার্ড দিয়ে ওকে দেখা করতে বললাম।

দুদিন পরে ও আমার অফিসে এলো। এর মধ্যেই আমি ঠিক করে নিয়েছি, ওকে কিভাবে সাহায্য করব। গোলপার্ক অঞ্চলে মোটা টাকা খরচ করে একটা বিউটি পার্লার করে দিলাম ওকে। নাম দিলাম—'শর্মিষ্ঠা'।

পরে কিন্তু শর্মিষ্ঠা আমাকে ভালোবেসে ফেলল। ওর অসহায় দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে ওকে ব্যবহার করিনি বটে, কিন্তু পায়ের নিচে শক্ত মাটি পেয়ে ও ভালোবেসে আমাকে যখন সর্বস্ব দিতে চাইল তখন ওকে গ্রহণ করতে কুণ্ঠিত হইনি।...

আজ আর শর্মিষ্ঠাকে যোগাযোগ করব না। বড় রেসের ব্যাপার আছে আজ। গতানুগতিক কিছু রিপোর্ট দেখলাম। কিছু কিছু নির্দেশ দিয়ে দিলাম

বড়বাবুকে। আমার এই অফিসটা রোফি আহ্‌মেদ কিদোয়াই রোডে। এটাই আমার হেড অফিস। খোদ কোলকাতাতেই আমার আরও তিনটে ব্রাঞ্চ অফিস আছে। এছাড়া নর্থ বেঙ্গলের শিলিগুড়ি, নর্থ চব্বিশ পরগণার বসিরহাট, হুগলি জেলার ডানকুনি, মেদিনীপুর জেলার কোলাঘাট ও মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুরে একটি করে ব্রাঞ্চ অফিস আছে আমার। আমার নানান ধরনের ব্যবসা। ট্রান্সপোর্ট, রাইস মিল, অয়েল মিল, সুগার মিল, চা-বাগান, কোল্ড-স্টোরেজ—পরবর্তীকালে প্রোমোটারের লাইনটাও ধরেছি। লাখ লাখ টাকার ব্যবসা আমার। একটাই আমার জেদ—আমি দেখতে চাই—ঘোড়া আর মেয়েমানুষ আমার কত লক্ষ টাকা ছিনিয়ে নিতে পারে!

আমার এই চল্লিশ বছর বয়সে বিলাসবহুল বৈচিত্র্যময় জীবনের বৃত্তান্ত পরে দেব। আপাতত অফিসে কিছু জরুরি নির্দেশ দিয়েই আমি ডুবে গেলাম 'টার্ফ নিউজ'-এ। আমার এক এজেন্টকে ফোন করে কিছু জরুরি আলোচনা করে নিলাম। বিষয় : আজকের রেস। এজেন্ট আমার কাছ থেকে আধঘণ্টা সময় চেয়ে নিল। জ্যাকপটের টিপ্‌স্ দেবে। কমিশন টেন পার্সেন্ট। মনোযোগ দিয়ে 'টার্ফ নিউজ' দেখছি। আজ ব্যাঙ্গালোর রেস। ইন্টার স্টেট বেটিং অপারেশন। আর. সি. টি. সি.-র সিলেকশন অনুযায়ী জ্যাকপট পুল—চার, পাঁচ, ছয়, সাত ও আট নং রেসে। আমি আলাদা কাগজে ফেভারিট ঘোড়াগুলোকে নোট করতে লাগলাম।

পঁচিশ মিনিট পরে এজেন্টের ফোন পেলাম। ইতিমধ্যে আমি চার থেকে আট নং রেসের ফেভারিট ঘোড়া বাছাই করেছি। এজেন্টের স্কুপ অনুযায়ী দুটো রেসের উইনিং হর্স-এর ব্যাপারটা আমাকে দোটানায় ফেলে দিল। ছয় ও আট নম্বর রেসে যে দুটো ঘোড়া আমার একেবারেই পছন্দ নয়—সেই দুটো ঘোড়াই এজেন্টের ফেভারিট। আমি দোনামোনা করছি দেখে আমার এজেন্ট জোর দিয়ে বলল, ছয় ও আট নম্বর রেসে নির্দ্বিধায় আমি যেন ওদের নির্দেশ মতো সিলেক্ট করি। জিতলে দশ নয়—পঁচিশ পার্সেন্ট কমিশন ওদেরকে দিতে হবে।

ঠিক করলাম, ছোট বাজি লাগাব আমার ফেভারিট ঘোড়ার ওপর আর বড় বাজি ধরব এজেন্টের ছয় ও আট নং ফেভারিট অনুযায়ী। পাঁচটা রেসের তিনটি ফেভারিট এজেন্টের সঙ্গে আমার মিলে গিয়েছিল। প্রশ্ন হল, ছয় ও আট নম্বর রেস নিয়ে। 'টার্ফ নিউজ'-এ আরও একবার চোখ বোলালাম। দেখলাম, ছয় ও আট নম্বর রেসে এজেন্টের ফেভারিট দুটো ঘোড়ারই মালিক দক্ষিণ ভারতের প্রখ্যাত বিজনেস ম্যাগনেট বি. আর. স্বামীনাথন। জকি যথাক্রমে জে. পাটিল ও ডি. শ্রীনাথ।

দুটোয় রেস শুরু। দেড়টার আগেই উঠে পড়লাম হাল্কা লাঞ্চ সেরে। মেম্বার্স এনক্লোজারে এনট্রি নিয়ে সরাসরি ঢুকে পড়লাম এসি-তে। ঠিক করলাম, আজকের বাজিতে ফলাফল যা-ই হোক না কেন, নির্বিকার থাকার চেষ্টা করব। উত্তেজনা, হতাশা, উদ্দীপনার কথা কেউ যেন জানতে না পারে।

রেস নম্বর এক, দুই এবং তিনে টানালা ও কুইনেলা, আমার ফেভারিট জ্যাকপট, এজেন্টের ফেভারিট জ্যাকপট—সব মিলিয়ে পনেরো হাজার টাকা বাজি লাগালাম। প্রথম রেস শুরু হতে আর ছ মিনিট বাকি। একটা নরম্যাল বিয়ার নিয়ে বসে পড়লাম।

আধ গ্লাস বিয়ার খেতে না খেতেই প্রথম রেস শুরু হয়ে গেল। চোখ বন্ধ করে কমেন্ট্রি শুনছি। যতই ভাবি উত্তেজিত হব না, ভেতরে ভেতরে কিন্তু উত্তেজিত হচ্ছি। চাপা উত্তেজনার মধ্যেই প্রথম রেস শেষ হল। ভাগ্য সুপ্রসন্ন। আমার ফেভারিট ঘোড়াগুলো প্লেসে এসেছে। রেজাল্ট পজিটিভ প্রথম রেসে।

দু নম্বর ও তিন নম্বর রেসেও বাজি জিতে গেলাম। চার নম্বর রেস শুরু হবার আগে আরও একটা বিয়ার নিলাম। হঠাৎ লক্ষ্য করলাম, নন্-স্মোকিং জোন থেকে কাচ ভেদ করে দুটি স্বপ্নের নারী-চোখ আমাকে যেন আহ্বান জানাচ্ছে। যাকে বলে চোখ দিয়ে ডাকা। চোখাচোখি হতেই মেয়েটির ঠোঁটের কোণে টুক করে বাঁকা হাসি খেলে গেল। আমি বুকপকেট থেকে ইন্ডিয়া কিংস-এর প্যাকেট ও লাইটার বের করে একটা সিগারেট ঠোঁটে চেপে প্যাকেটটা সামান্য তুলে ধরলাম মেয়েটির দিকে। যেন ইশারায় বলতে চাইছি, 'চলবে নাকি?'

নিমেষে মেয়েটি হাসলো, পাক্কা ক্লোজ-আপ-এর হাসি। মাঝের দরজা ঠেলে সরাসরি আমার সামনে চলে এলো ও। সোফায় আমার পাশে জায়গা দেখিয়ে ওকে বসতে বললাম ইশারায়। ও মৃদু হাসি বজায় রেখে বসল আমার পাশে। সামনেই টিভিতে তখন চার নম্বর রেসের দরের ওঠা-নামা দেখিয়ে চলেছে। আমি প্যাকেট খুলে ওর দিকে বাড়িয়ে ধরলাম। ও একটা সিগারেট তুলে নিল। আমি লাইটার জ্বেলে ওর সিগারেটে আগুন দিয়ে আমারটা ধরালাম।

ও আমার বাঁদিকে বসেছে। বাঁ হাতটা সোফার ওপরে তুলে দিয়ে আমি ওর দিকে সামান্য ঘুরে বসলাম। টিভি-র খবর আমার কাছে তুচ্ছ। আমি যেখানে যা বাজি লাগাবার লাগিয়ে দিয়েছি। এখন মেয়েটিই আমার কাছে মুখ্য। যা দারুণ দেখতে! কী অসাধারণ বাঁধা যৌবন! রূপ আর যৌবন যেন রেষারেষি করে ঝাঁপিয়ে পড়েছে একই জায়গায়। মেয়েটির স্বচ্ছ সিন্থেটিক শাড়ি ভেদ করে আমার দৃষ্টি পৌঁছেছে ওর অনাবৃত জায়গাগুলোয়। ও বগল-কাটা জামা পরেনি। যাকে বলে গুণ্ডা-হাতা, চার আঙুল ঊর্ধ্ববাহু ঢাকা ব্লাউজ, ছোট ঝুল—ফলে, স্তনের নিচে থেকে পেটের অনেকটা অংশ প্রকট দৃশ্যমান। চাঁপা ফুলের মতন গায়ের রঙ। স্টেপকাট চুল ভয়ঙ্কর অবাধ্য হয়ে মুখের অর্ধেকটা ঢেকে দিতে চাইছে। খোলা কাঁধ থেকে পিঠের প্রায় অর্ধেকটা চোখ ধাঁধিয়ে দেয়, ঠিক যেন সাদা তুষারে সূর্যের কিরণ।

আমার বাঁ-হাতটা ঠিক ওর মাথার পেছনে। আমি ওর মাথায় একটা টোকা দিয়ে বললাম, 'কী, বিয়ার খাবে তো?'

ও হেসে বুঝিয়ে দিল, আপত্তি নেই। আমি বেয়ারাকে আর একটি গ্লাস দিতে বললাম। দুটি গ্লাসে বিয়ার ঢেলে ওর হাতে একটা ধরিয়ে দিলাম। ও হেসে বলল, 'ধন্যবাদ।'

এই প্রথম কথা বলল ও। 'থ্যাঙ্ক য়ু' নয়—'ধন্যবাদ'। কণ্ঠস্বরটি মায়াবী আবেগে ডোবানো। আমি সরাসরি ওর রূপের প্রশংসা করলাম। চাপা গলায় বললাম, 'অপূর্ব, অসাধারণ!'

মেয়েদের প্রশংসার স্তুতি করতে আমি নির্দ্বিধায় এতটুকু সময় নিই না। ও বোধহয় শুনতে পায়নি। জিজ্ঞেস করল, 'কী?'

আমি বললাম, 'না, মানে—তুমি এতো সুন্দর—'

ও চকিত লাজে মুখ নামালো। বলল, 'অথচ আমি কিন্তু আপনাকেই হাঁ করে দেখছিলাম।'

আমি কৌতুক করে বললাম, 'তাহলে আপনি বলছ কেন? শোনো, তোমাকে আমি ঝিলিক বলে ডাকব। কী, আপত্তি নেই তো?'

ও একটু অবাক হয়ে আমার দিকে তাকালো। কয়েক মুহূর্ত। তারপরে অবিশ্বাসের সুরে বলল, 'আপনি কি আমার নাম জানতেন? আমার নাম কিন্তু ফুল্‌কি। মানে, ঝিলিক আর ফুল্‌কি তো—'

আমি চোখে হাসি বজায় রেখে ঈষৎ আবেগ মাখিয়ে বললাম, 'তোমার নাম আমি জানব কী করে! তোমাকে দেখে আমার এক ঝলক আলোর কথাই মনে হয়েছে। কিন্তু ঝিলিক, তুমি কখন থেকে আমাকে তুমি বলবে?'

ও বলল, 'বেশ। আমিও তাহলে তোমার একটা নাম দিচ্ছি—বিদ্যুৎ। ঠিক আছে?'

ফুল্‌কি সত্যিই আমাকে চমকে দিল! আসলে আমার নাম তড়িৎ! তড়িৎ সিন্‌হা।

কিছু না বলে আমি মুগ্ধ দৃষ্টিতে ওর দিকে চেয়ে রইলাম।

চতুর্থ রেস শুরু হল। আমার চোখ স্থির ঝিলিকের দিকে। কমেন্ট্রি শুনছি।

আমার ফেভারিট তৃতীয় স্থানে। উত্তেজনা জল হয়ে যাচ্ছে ঝিলিকের চোখে। আমার ফেভারিট দ্বিতীয় স্থানে...আমার ফেভারিট উঠে আসছে উইনে...উইনে...উইন...!

আমার বাঁ-হাত অস্থির চঞ্চলতায়, খুশিতে ঝিলিকের গলা জড়িয়ে ধরল। ওর হাতে ধরা গ্লাস থেকে খানিকটা বিয়ার চলকে পড়ল উরুর ওপর শাড়িতে। আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, 'সরি।'

ও বলল, 'কিচ্ছু হয়নি। তাহলে? আমি নিশ্চয়ই আপনার, মানে তোমার অপয়া নই?'

আমি ডগমগ উচ্ছ্বাসে বললাম, 'তোমার ভাগ্যেই আজ বাজিমাৎ হোক। আমরা সেলিব্রেট করব।'

স্তনের নিচে থেকে পেটের অনেকটা অংশ প্রকট দৃশ্যমান

বিয়ার শেষ করে কিছু হাল্কা স্ন্যাক্স্-এর অর্ডার দিলাম। ঝিলিক জিজ্ঞেস করল, 'এ-পর্যন্ত চারটে রেসে তোমার রেজাল্ট কি?'

আমি উচ্ছ্বসিত হয়ে বললাম, 'দারুণ! ঠিক তোমার মতন। শুধুই ফুল্‌কি। আজ তোমাকেও বাজি ধরব!'

ও ঝরণার মতন শব্দ করে হাসলো। ঝকঝকে সাদা দাঁতের হাসি। বলল, 'আমাকে আর বাজি ধরতে হবে না। আমি যে শুরুতেই বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়েছি!'

আমি অবাক বিস্ময়ে বললাম, 'সত্যি?'

ও বলল, 'বিশ্বাস হচ্ছে না? কোন্‌দিন নিজের জীবনটাকেই বাজি ধরে ফেলবে হয়তো!'

ওর কথাটা শুনে চমকে উঠলাম! জীবন নিয়ে বাজি!

আমাকে নীরব দেখে ও আবার বলল, 'ঘোড়ায় বাজি রাখছ, আমাকে বাজি রাখতে চাইছ। বলা যায় না, জেতার জন্য হয়তো নিজেকেই বাজি রাখবে একদিন!'

অস্ফুটে আমি বলে ফেললাম, 'সে-বাজিতে যদি হেরে যাই—'

কথাটা ঝিলিকের কানে যায়নি। ও আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো। কয়েক মুহূর্ত কেটে গেল। আমি ডুবে যাচ্ছিলাম ওর রূপের সাগরে। মনে মনে বলে ফেললাম, 'তোমাকে বোধহয় ভালবাসতে চাইছি। কিন্তু—'

'কি হল? বিদ্যুৎ মেঘের আড়ালে কেন,' ওর স্বরে যেন আমার ঘুম ভেঙে গেল।

আমি বললাম, 'বিনামেঘে বজ্রপাতের ভয়ে!'

ও বলল, 'বজ্রপাত তো শুরুতেই হয়ে গিয়েছে। যাই হোক, পাঁচ নম্বর রেস শুরু হতে আর দেরি নেই।'

আমি বেয়ারাকে ডেকে দুটো ব্ল্যাক ডগ হুইস্কি দিতে বললাম। হুইস্কিতে আইস-কিউব মিশিয়ে ওকে দিলাম, নিজেও নিলাম। হুইস্কিতে চুমুক দিয়ে এক টুকরো স্ন্যাক্স্ মুখে ফেলতেই পাঁচ নম্বর রেস শুরু হল। শুরু থেকেই আমার ফেভারিট ঘোড়া পাঁচ লেংথে এগিয়ে। অনায়াস উইন।

আমি অচঞ্চল, নির্বিকার। ঝিলিক বলল, 'কি ব্যাপার? তোমার ভাগ্য কী বলছে?'

আমার মুখে হাসি ছড়িয়ে পড়ল। হুইস্কিতে চুমুক দিলাম। বললাম, 'উইন, তোমার ভাগ্য!'

ও-ও চুমুক দিল। হাসলো। কিছুক্ষণ আমাকে যেন নিরীক্ষণ করল। তারপর বলল, 'তোমাকে দেখে মনে হয় যেন কতকালের চেনা!'

আমি বললাম, 'যেন বলছ কেন? কোনও সন্দেহ আছে?'

ও বলল, 'এরকম কথা শুনলে কিন্তু অনুভূতিটা কেমন বদলে যেতে চায়।'

আমি বললাম, 'বজ্রপাতের পরে এখনও অনুভূতি বদলায়নি?'

ও সলাজে এমনভাবে মাথা নিচু করল, ঠিক যেন এক চোদ্দ বছরের কিশোরী।

গ্লাসে চুমুক দিয়ে সিগারেট ধরালাম। ততক্ষণে ও মুখ তুলেছে। বললাম, 'তোমার কসম, ছ নম্বর রেসটা জিতিয়ে দিও।'

ও বলল, 'আমি তোমাকে জেতাবার কে! আমি একজন সামান্য নারী। তোমার জন্য বড়জোর প্রার্থনা করতে পারি।'

আমি বললাম, 'তাই কোরো, তাতেই হবে।'

বলতে বলতেই আমার দৃষ্টি আটকে গেল কাচের বাইরে, উন্মুক্ত ছায়া-ঢাকা অঙ্গনে। ইভিনা দাঁড়িয়ে আছে বুকমেকারদের গোলঘরের সামনে। হয়তো আমাকে খুঁজছে। বা অন্য কাউকে। ও তো জানে, আমি এই চত্বরের মধ্যেই কোথাও না কোথাও আছি। আমার দৃষ্টি অনুসরণ করে ঝিলিক ঘাড় ফেরালো বাইরের দিকে। কী দেখলো জানি না, বলল, 'কোনও পার্বতী হয়তো তার শিবঠাকুরকে খুঁজে বেড়াচ্ছে!'

আমি বললাম, 'কিন্তু শিবঠাকুর তো তার পার্বতীকে পেয়ে গেছে!'

ঝিলিক বলল, 'কী জানি, কল্‌কে ফাটিয়ে শিবঠাকুর কখন যে কাকে পার্বতী বলে ভুল করে!'

ওর কথা শুনে আমি মৃদু শব্দ করে হেসে উঠলাম। ঠিক তখনই ছ নম্বর রেস শুরু হল।

আমি কাঠ হয়ে রিলে শুনছি। ঝিলিকও টেনশনে স্ট্যাচু হয়ে গেল। রিলে রেগুলার না শুনলে, কিছু বোঝা যায় না, চোখের ওপর রেসটা ভাসে না। যারা রিলে বোঝে, তাদের চোখের সামনে রেসটা ভেসে ওঠে।

আমি শুনছি, আমার ফেভারিট ঘোড়া এগিয়ে আছে, তার পাঁচ-ছ লেংথ্ পিছিয়ে আছে এজেন্টের ফেভারিট। পরমুহূর্তেই এজেন্টের ফেভারিট দারুণ গ্যালপ করে এগিয়ে আসছে। আমার ফেভারিট পিছিয়ে পড়ছে। এজেন্টের ফেভারিট তীর বেগে টপকে আসছে সবাইকে। তৃতীয় স্থান টপকে ফাইনাল বেন্ড নিয়ে দ্বিতীয় ঘোড়াকে অতিক্রম করে প্রথম ঘোড়ার পাশাপাশি ছুটছে। দ্বিতীয়কেও ছাড়িয়ে যাচ্ছে। আর মাত্র পঞ্চাশ মিটার বাকি। মেরে দিল দ্বিতীয়কে। উইন...। উইন করল এজেন্টের ফেভারিট। দম-বন্ধ শ্বাসটা এক দমকে বেরিয়ে এলো বুক হাল্কা করে।

ঝিলিকের চোখ ফেটে জল আসছে। ও বুঝতে পারেনি আমার ভাগ্যে কী ঘটল। আমি ওর ডান হাতটা তুলে হাল্কা চাপ দিয়ে বললাম, 'তোমার প্রার্থনা মিথ্যে হয়নি। তুমি জিতেছ।' ও-ও দম ফেলে বাঁচলো। বলল, 'বাব্বা, যা ভয় পেয়ে গেসলাম! এতো টেনশন নিয়ে খেলার কী দরকার!'

আমি বললাম, 'ওই টেনশনটাই তো আসলে বেঁচে থাকা। হারজিতের চেয়ে টেনশনটাই বড়। জীবনের গতানুগতিকতায় আর কোথাও আমার টেনশন নেই। রেসের মাঠ না থাকলে আমার জীবনটা পান্‌সে হয়ে যেত। ঘোড়ার মতোই রক্ত টগবগিয়ে ওঠে রেসের মাঠে এলে। একটা ঝকঝকে স্বাস্থ্যবান ঘোড়া দেখলেই মন ভালো হয়ে যায়। রেসে জিতলে দারুণ আনন্দ হয়—আবার হেরে গেলে মন ভার হয়ে যায়। কিন্তু আনন্দ বা দুঃখের চেয়ে যেটা বড়, তা হল বেঁচে থাকার তীব্র অনুভূতি। থ্রিল। ওটা না থাকলে আনন্দ বা দুঃখ—সব ভেসে একাকার হয়ে যায়।'

ঝিলিক গ্লাসের তলানিটুকু শেষ করে বলল, 'কী জানি বাপু, আমার তো মনে হয় পুরুষের কাছে নারীই সবচেয়ে বড় থ্রিল হওয়া উচিত। বেঁচে থাকার, জীবনকে উপভোগ করার মূল উৎস। নারীসঙ্গই পুরুষের যৌবনকে দীর্ঘদিন ধরে রাখতে পারে।'

আমার গ্লাস আগেই খালি হয়েছিল। বেয়ারাকে ডেকে দুটো লার্জ হুইস্কি আর বরফ দিতে বললাম। ঝিলিকের দিকে ফিরে বললাম, 'তোমার ফিলোজফি ভুল নয়। তবে, নারীসঙ্গ, যে-নারীকে তুমি পুরুষের থ্রিল বা বেঁচে থাকার উৎস হিসেবে বলতে চাইছ—তাকে অবশ্যই পরনারী হতে হবে। অবৈধ, গোপন সম্পর্ক না হলে সব মাটি হয়ে যায়। আর,

তার জন্য দরকার অতিরিক্ত অর্থ। মাপা রোজগারে যাদের সংসার চালাতে হয় তাদের পক্ষে মেয়েমানুষ পোষা বা পরনারী গমন সম্ভব নয়। কিন্তু যার অঢেল টাকা আছে, যে কিনা পাঁচটা মেয়েমানুষ পুষতে পারে, তাকেও তো বেঁচে থাকতে হবে! বেঁচে থেকেও যে মৃত—তার কাছে রূপসী নারী আর একটা মাদী কুকুরে কোনও তফাৎ আছে কি? এই বেঁচে থাকাটাই আমার কাছে রেস। যা কিনা নিরন্তর আমাকে ছুটিয়ে নিয়ে চলেছে, আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছে। থেমে গেলে সব কিছুই থেমে যাবে। যার অপর নাম মৃত্যু—বেঁচে থেকে মৃত্যুকে অনুভব করা, একটু একটু করে মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করা, ঠিক যেন বিষের সঙ্গে আপোস করে অমৃত গ্রহণ করা!'

ঝিলিক আমার মুখের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে আছে। ড্রিঙ্কস্ এলো। বরফ মিশিয়ে ওকে একটা গ্লাস তুলে দিলাম। আমার গ্লাসে বরফ দিয়ে সিগারেট ধরালাম। ওর দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে বললাম, 'তোমার মতন সোনালি-সুন্দরীকে পেতে হলে আগে তো তার যোগ্য হতে হবে। ঠিকমতো বেঁচে থাকাটাই সেই যোগ্যতা। আর ঠিকমতো বাঁচতে পারলে, জীবনের সঠিক স্বাদ গ্রহণের জন্যে নারী ছাড়া কোনও বিকল্প নেই। পরনারী। সুন্দরী, স্বাস্থ্যবতী, আকর্ষণীয়। তাই বলছিলাম, টগবগে জীবনের জন্য আমার কাছে রেস অনিবার্য। মাইনাস রেস—জীবনের সব কিছুই শূন্য।'

কথা শুনতে শুনতে ঝিলিক ঘন ঘন ছোট ছোট চুমুক দিচ্ছে গ্লাসে। আমার কথা শেষ হতে ও বেশ বুদ্ধিমতীর মতন প্রশ্ন করল, 'তাহলে তুমি বলতে চাইছ—যারা রেস খেলে না বা রেসের মাঠে যায় না এবং যথেষ্ট বিত্তবান, তারা সবাই মৃত?'

আমি বললাম, 'সব মানুষ একভাবে বাঁচে না। একেক জনের কাছে বেঁচে থাকাটা এক-একরকম। আপেক্ষিক বলতে পারো। ধরো, একটা বড় ঝিল। ঝিলের জলে, পাঁকের নিচে নানা ধরনের প্রাণী জন্মাচ্ছে, বিচরণ করছে, ঝিলের জলে গাছের ছায়া পড়ছে, সেই জলের ওপর বোট চলছে সকাল বিকেলে—সেই জলের বুকে বাতাসের কাঁপন আছে কিন্তু আন্দোলন নেই, হিল্লোল নেই—জলরাশি সেখানে স্তব্ধ, নিশ্চল, গতিহীন। এবারে তুমি ভাব একটি নদীর কথা। যার গতি কখনই থেমে নেই। পাহাড়ি নদী অবিরাম একমুখী স্রোত নিয়ে বয়ে চলেছে। আর সমতলের নদীতে

জোয়ার-ভাটা নিরন্তর। ঝিলের জল থেকে পচা পেঁকো গন্ধ এসে লাগে নাকে আর স্রোতস্বিনী নদী বুকে করে আবর্জনা বহন করে নিয়ে যায় সাগরে। ঝিলে জল, নদীতেও জল। এই দুই জলের মধ্যে আমি নদীর জলে বাঁচি। স্রোত যেখানে নিরন্তর, থেমে থাকার কোনও প্রশ্ন নেই। আসলে আমি গতি ও গতিহীনতার কথা বলতে চাইছি। যে গতি আমি রেসের মাঠে পাই। অন্য কেউ সেই গতি অন্য কোথাও পেতে পারে। আবার এমন মানুষ আছে, যার কাছে গতি এবং গতিহীনতার কোনও পার্থক্য নেই। সে-মানুষ আমার কাছে মৃত।'

ঝিলিকের গোটা মুখে হাসি ছড়িয়ে পড়েছে। ঠিক মাধুর্যের মতন। ও বলল, 'তোমার কথা শুনতে বেশ লাগে। বিতর্কে যাব না, তবে একটা কথা—নারীও কিন্তু পুরুষের গতি।'

আমি বললাম, 'অবশ্যই, আগেই স্বীকার করেছি। তবে জীবিত পুরুষের কাছে!'

সপ্তম রেস শুরু হতে চলেছে। ছ নম্বরের 'উইন' জিতে এখন আমি অনেকটা নিশ্চিন্ত ও আশাবাদী। মনে হচ্ছে বড় বাজি আজ কপালে নাচছে। দেখা যাক।

সপ্তম রেসের 'উইন' নিয়ে কোনও বিতর্ক ছিল না এজেন্টের সঙ্গে। তবে ষষ্ঠ রেস শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে জ্যাকপটের স্বপ্ন বুদবুদের মতন উবে গেছে অনেকের। সাত নম্বরের 'উইন' আমাদের ফেভারিট। আট নম্বর বাজিটা মারতে পারলেই বাজিমাৎ। আর এক পাত্র করে হুইস্কি এলো।

আমি ঝিলিককে বললাম, 'ঝিলিক, আট নম্বর রেসটা জিততে পারলে ধরে নেব, আজ তোমার ভাগ্যেই আমার সাফল্য। তুমি কিন্তু প্রার্থনা শুরু করে দাও। আর একটা কথা। আট নম্বর রেস জেতা মানেই 'জ্যাকপট' পাচ্ছি। আমার কাছ থেকে তুমি একটা উপহার পাবে। এবং অবশ্যই সেটা তোমার পছন্দ অনুযায়ী।'

ঝিলিক কপট অভিমানের সুরে বলে, 'আমি কেন তোমার কাছ থেকে উপহার নেব! আমি তো তোমাকে কোনও টিপ্‌স্ দিইনি! তাছাড়া, আমরা পরস্পরকে সত্যিই এখনও চিনি না।'

আমি হতাশ স্বরে বললাম, 'সেকি! তখন যে তুমি বললে, আমাকে তোমার কতকালের চেনা মনে হয়—অনুভূতি বদলে যেতে চায়—! এখন বলছ, কেউ কাউকে চিনি না!'

ঝিলিক বলল, 'আচ্ছা, এই যে ঘোড়ায় বাজি ধরো—এর জন্যে তো ঘোড়ার চোদ্দ পুরুষের ইতিহাস ঘাঁটো—খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব পারফরম্যান্স বিচার করো। তারপর বুঝে-সুঝে বাজি ধরো। আমাকে বলো তো, আমার কোনও কিছু না জেনেই উপহারের জন্য টাকা ঢালবে কোন্ ভরসায়?'

আমি বললাম, 'প্রথমত তুমি ঘোড়া নও—মানুষ। নারী। তোমার ইতিহাসে আমার কোনও প্রয়োজন নেই। দ্বিতীয়ত, তোমার পেছনে আমি কোনও বাজি লাগাচ্ছি না। জুয়া আর আন্তরিক একটি ইচ্ছাকে তুমি একই মাপকাঠিতে মাপতে চাইছ? তুমি কি ভাবছ, কোনও স্বার্থের কথা ভেবে তোমাকে আমি হাত করতে চাইছি? আমাদের আর কখনও দেখা হবে কিনা, তাও কি আমরা জানি? আমি তো শুধুমাত্র আমার খুশির কিছুটা ভাগ তোমাকে দিতে চেয়েছি। তোমার যদি ইচ্ছে না হয়—'

'প্লিজ—' ঝিলিকের চোখের পাতা ভারি, স্বর অস্পষ্ট, 'তোমার সঙ্গে আর কখনও ঠাট্টা করা যাবে না—'

ওর স্বর ডুবে গেল। আমি দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে বললাম, 'কাউকে ভালো লাগলে তার ব্যাকগ্রাউন্ড বা চালচিত্র সম্পর্কে আমার কোনও কৌতূহল জাগে না। তবে, তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হলে একসময় তার সম্পর্কে সবই জানা হয়ে যায়। আগে সম্পর্ক, পরে জানাজানি—আগে জানাজানি, পরে সম্পর্ক কখনই নয়।'

ঝিলিক দু-হাত জড়ো করে চোখ বুজে আছে। আট নম্বর রেস শুরু হচ্ছে। আমি একটা বড় চুমুক দিলাম গ্লাসে।

ছ নম্বর ড্র থেকে আমার ফেভারিট ঘোড়া প্যারালাল ডিসট্যান্স ছাড়িয়ে রেলিং পেয়ে গেল। প্রথম চারের মধ্যে এজেন্টের ফেভারিট নেই। আমি সিঁটিয়ে গেলাম। কিন্তু মুহূর্তের জন্যেই। এজেন্টের ফেভারিট ঘোড়া 'ব্ল্যাক বার্ড' বিধ্বংসী গতিতে সবাইকে টপকাতে শুরু করেছে। শেষ বাঁক নিয়ে প্রথম ঘোড়াকে অতিক্রম করতে উদ্যত। আর কুড়ি লেংথ্ বাকি। প্রথম

ঘোড়াটা 'ব্লু ডায়মন্ড'—আমার ফেভারিট। তার থেকে এক লেংথে মার খেয়ে গেল 'ব্ল্যাক বার্ড'।

সব শেষ। আমার মাথার ভেতরটা একেবারে শূন্য। ঝিলিক আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পেরেছে, হতাশার চাপে আমার দু-কাঁধ ঝুলে গিয়েছে। ওর মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছে। আমি একটু হাসবার চেষ্টা করলাম। ঝিলিকের ঠোঁট দুটো নড়ে উঠল, 'আমি অপয়া!'

মাইক্রোফোনে ঘোষকের গলায় কিঞ্চিৎ আশার আলো ফুটে উঠল। প্রথম ও দ্বিতীয় স্থানের ফলাফল পরে জানানো হচ্ছে। স্টুয়ার্ডস্ এনকোয়্যারি হচ্ছে। তার মানে কিছু গণ্ডগোল হয়ে থাকবে। পান্টাররা পরিষ্কার শুনেছে, 'ব্ল্যাক বার্ড' এক লেংথে 'ব্লু ডায়মন্ড'-এর কাছে হেরে সেকেন্ড হয়েছে।

ঘোষণা শোনার পর অনেকের মুখ শুকিয়ে গেল। 'ব্ল্যাক বার্ড'-এর চেয়ে 'ব্লু ডায়মন্ড'-ই পান্টারদের ফেভারিট ছিল। আমি অবশ্য দু-সেট বাজি লাগিয়েছি। যে-ই উইন করুক আমার হার নেই। তবে টাকা বেশি কমের প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে। আমি ঝিলিককে বললাম, 'তুমি অপয়া নও।'

আমি পুরো হুইস্কিটা গাল্প করলাম। বাইরে কাচের ওপারে ইভিনাকে দেখতে পেলাম। বোধহয় কাউকে খুঁজছে। হয়তো আমাকেই। গতকাল 'কুইনি' হেরে ওর সঙ্গ পাবার জন্য অধৈর্য হয়ে উঠেছিলাম। আজ আমার সামনে ঝিলিক বসে।

একটা অনিশ্চয়তার মধ্যে ঝুলে আছি। 'ব্ল্যাক বার্ড' উইন পেলে পরিস্থিতি বদলে যাবে। ঝিলিক কোথায় থাকে জানি না। ও কি কলগার্ল? ওর কি নিজের ঘর আছে? কিছুই তো জানি না। 'ব্ল্যাক বার্ড' উইন করলে আজ সন্ধ্যায় কোথায় যাব? ইভিনার সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে না তো? 'জ্যাকপট' জিতে বাড়ি গেলে জোড়া বউ-এর মধ্যে কাড়াকাড়ি পড়ে যাবে—কে আমাকে নিয়ে থাকবে। বাড়িতে জোড়া বউ, মাঠে জোড়া মেয়েমানুষ—সবাই আমাকে পেতে চাইবে। আমি কার কাছে যাব?

আমার মনে হল, ঘরে-বাইরে আমি জোড়া মেয়েমানুষ এবং জোড়া ঘোটকীর মাঝখানে আবদ্ধ হয়ে গিয়েছি। কখনও মনে হচ্ছে, এই চারটি প্রাণীই মেয়েমানুষ—পরমুহূর্তেই মনে হচ্ছে—না না, এরা সকলেই ঘোটকী।

আর এই চারটি ফিলিতেই আমার জ্যাকপটের বাজি ধরা আছে। চারটি রেসের চারটি ফেভারিট। ঝিলিক, ইভিনা, জোড়া বউ—হিয়া আর পিয়া সবাই দৌড়চ্ছে রেসের মাঠে।

যত সব উদ্ভট চিন্তা আমার মাথার মধ্যে জট পাকাচ্ছে। আমি ঠিক বুঝতে পারছি না—'ইয়োর অ্যাটেনশন প্লিজ'—মাইক্রোফোনে ঘোষকের গলা, 'ইন দ্য লাস্ট রেস, হেল্ড অ্যাট ব্যাঙ্গালোর, ইট হ্যাজ বিন ডিসাইডেড বাই দ্য স্টুয়ার্ড দ্যাট ডিউ টু লস অফ ওয়েট 'ব্লু ডায়মন্ড' হ্যাজ বিন ডিক্লেয়ার্ড ডিসকোয়ালিফায়েড। 'ব্ল্যাক বার্ড' হ্যাজ ওন দ্য রেস। থ্যাঙ্ক য়ু।'

আমার সারা শরীরে রক্তের ম্যারাথন শুরু হয়ে গেল। দ্রুত বেয়ারাকে ডেকে দুটো পাঁচশো টাকার নোট গুঁজে দিয়ে ঝিলিককে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। বুকমেকারের কাউন্টারে গিয়ে এজেন্টের লোককে খুঁজে পেলাম। সে উচ্ছ্বাসে আমাকে প্রায় জড়িয়ে ধরল। আমি সবকটা টিকিট ওর হাতে দিতে দিতে জিজ্ঞেস করলাম, 'কি ব্যাপার বলো তো পঞ্চা, ছয় আর আট-এর রেসের টিপ্‌স্‌টা একেবারে ভেল্‌কি হল কী করে? আমি তো ভাবতেই পারিনি!'

পঞ্চা টিকিটগুলো চেক করতে করতে বলল, 'সিন্‌হা সাহেব, ভেল্‌কি তো বটেই। তবে এ-ব্যাপারে আমি কিছু বলব না। দাস সাহেবকে জিজ্ঞেস করবেন।'

আমি বললাম, 'ঠিক আছে। তুমি টাকা নিয়ে কাল আমার অফিসে চলে এসো। আমি এখন বেরিয়ে যাচ্ছি।'

পঞ্চা বলল, 'ঠিক আছে, স্যার।'

ঝিলিককে নিয়ে গাড়ির দিকে এগিয়ে গেলাম। গাড়ির কাছাকাছি পৌঁছতে দেখলাম, ইভিনা দাঁড়িয়ে আছে আমার অপেক্ষায়। ও আমার গাড়ির অবস্থান এবং ড্রাইভার কালু মিঞাকে চেনে। আমি চট করে দাঁড়িয়ে পড়লাম। পার্স খুলে একগাদা পাঁচশো টাকার নোট আর একটা ভিজিটিং কার্ড বের করে ঝিলিকের হাতে ধরিয়ে দিলাম। বললাম, 'আমার তাড়া আছে। কাল ফোন কোরো অফিসে।'

ঝিলিক নোটগুলো আমার হাতে ফিরিয়ে দিয়ে বলল, 'তুমি যা ভাবছ, আমি তা নই। কার্ডটা রেখে দিচ্ছি। ফোন করব।'

আমি যথেষ্ট ঘাবড়ে গিয়ে শাক দিয়ে মাছ ঢাকার চেষ্টা করলাম, 'আমি কিছুই ভাবিনি ঝিলিক, তোমার উপহারটা—'

'ইচ্ছে হলে কিনে দিও। নগদ টাকা দিয়ে অপমান কোরো না।' ঝিলিকের স্বরে চাপা রোষ।

মুহূর্তে ঝিলিক সম্পর্কে আমি সতর্ক হলাম। সত্যিই আমি যা আন্দাজ করেছিলাম, ও তা নয়। আসলে আমাকে ওর ভালো লেগেছে। সরল দুর্বলতা। প্রেমের অনুভূতি? হতেও পারে। আমি ওর একটা হাত ধরে মিনতি করলাম, 'ক্ষমা করে দিও, ঝিলিক। খুব অন্যায় হয়ে গেছে। আমি তোমাকে অপমান করতে চাইনি।'

হেসে ফেলল ও। অসাধারণ এক নারী মনে হল ওকে। বলল, 'কাল তো রেস নেই। দুপুরে কি করছ?'

আমি বললাম, 'ঠিক জানি না। তুমি অফিসে ফোন কোরো।'

ও এগিয়ে গেল। আমার দৃষ্টি ওকে অনুসরণ করল। পার্কিং লটে পৌঁছে একটা মারুতি 'জেন'-এর দরজা খুলে ড্রাইভিং সীটে বসে দরজা বন্ধ করল ও। তারপরেই হুস্ করে বেরিয়ে গেল গাড়িটা।

আমি বিহ্বল হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম কিছুক্ষণ।

হঠাৎ চোখ পড়ে গেল সেই অশীতিপর বৃদ্ধের ওপর। অনেকবার দেখেছি এই বৃদ্ধকে। বয়স আশির ওপর। দু-পাশে দুজনের কাঁধে ভর দিয়ে হাঁটেন। মধ্যবয়সী একজন পুরুষ, একজন মহিলা। ঠিক বুঝতে পারি না, এতো বয়সে এতো কষ্ট স্বীকার করে মাঠে আসেন কী করে এবং কেন? আর ওই মহিলা ও পুরুষ—ওরাই-বা কারা! যথেষ্ট দুর্ভোগ ভোগ করতে হয় ওঁদের বৃদ্ধটির জন্য।

আমি এগিয়ে গেলাম বৃদ্ধটির সামনে। পথ আটকে দাঁড়ালাম ওঁর মুখোমুখি। বৃদ্ধের সব কটি ভুরু সাদা। দু কানের ওপর থেকে ঘাড় পর্যন্ত ইঞ্চিটাক চওড়া সাদা চুলের পাতলা সমাবেশ। চোখের কোল বসা, চোখ দুটি কোটরাগত। গায়ের রঙ পোড়া তামাটে। পরনে মলিন ধুতি-পাঞ্জাবি, পায়ে টায়ারের চটি। সঙ্গী মহিলা ও পুরুষটিকে দেখে মনে হয় নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের প্রতীক।

পথ অবরুদ্ধ হওয়ায় বৃদ্ধ বিস্মিত চোখে আমার দিকে তাকালেন। আমি কোনও রকম ভূমিকা না করে সরাসরি জিজ্ঞেস করলাম, 'কোন্ দিকে যাবেন? আপত্তি না থাকলে আপনাদের পৌঁছে দিতাম।'

বৃদ্ধ বললেন, 'না না, তার কোনও দরকার নেই, আমরা ঠিক চলে যাব।'

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'কোন্ দিকে যাবেন?'

সঙ্গী ভদ্রলোক বললেন, 'আমরা পাইকপাড়ায় থাকি।'

আমি বললাম, 'চলুন না, কোনও অসুবিধা হবে না। আমি ওদিকেই যাব।'

অগত্যা ওঁরা রাজি হলেন। আমি ওঁদের নিয়ে আমার গাড়ির দিকে এগোলাম। আমাকে দেখে ইভিনা এগিয়ে এলো। বলল, 'কোথায় ছিলে? কত খুঁজেছি তোমাকে।'

আমি বললাম, 'ছিলাম অজ্ঞাতবাসে।'

ও ঠোঁট ফুলিয়ে বলল, 'অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছি তোমার জন্যে। যাবে তো?'

আমি বললাম, 'আজ না। একটা কাজ পড়ে গিয়েছে। নর্থের দিকে যেতে হবে একটু। কাল ফোন কোরো অফিসে।'

ও বলল, 'ঠিক আছে। আজ কেমন হল?'

আমি বললাম, 'মোটামুটি। খারাপ না।'

ও বলল, 'মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে। ঠিক আছে, চললাম। কাল কথা হবে।'

এগিয়ে গেল ইভিনা।

বৃদ্ধ ও তাঁর সঙ্গীদের পিছনে বসিয়ে আমি সামনে কালুর বাঁ দিকে বসলাম। কালু গাড়ি ছেড়ে দিল। আমি একটা সিগারেট ধরিয়ে পেছন দিকে মুখ ফেরালাম। ওঁরা তিনজনেই আমার মুখের দিকে তাকালেন। আমি বললাম, 'এত কষ্ট করে অত দূর থেকে আসেন—'

সঙ্গী ভদ্রলোক বললেন, 'কিছুটা দায়ে পড়েই আসতে হয়। আপনি শুনতে চাইলে—'

'শুনব,' আমি বললাম, 'আপনাদের বাড়ি গিয়েই শুনব।'

ভদ্রলোক বললেন, 'বাড়ি আর বলছেন কাকে, থাকি তো বস্তিতে।'

কৌতূহল বাড়ছে আমার। বস্তি থেকে রেসের মাঠ! তা-ও এতো দুর্ভোগ মাথায় নিয়ে!

কালু বলল, 'সাব—?'

আমি বললাম, 'হ্যাঁ, পাইকপাড়া চলো।'

ভদ্রলোককে বললাম, 'দেখুন—রেসের মাঠ, ধর্মস্থান, পাগলা গারদ, আদালত, জেলখানা আর শ্মশানে যাঁদের আসতে হয় তাঁরা কোথা থেকে আসেন, কেন আসেন, সেটা বড় কথা নয়। কোন্ সমাজ থেকে, কোন্ পরিস্থিতিতে, কতটা অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতায় বা কী কারণে আসতে হয়—সেটাও প্রশ্ন নয়। আসলে এটা ঘটনা। ঘটে, ঘটে চলেছে। এখানে আগন্তুকদের আলাদা কোনও সত্তা নেই। আর একটা ব্যাপার আমি অনুভব করি—পাগল, ভিখিরি, শিশু, মৃতদেহ এবং গণিকা—এদেরও আলাদা কোনও জাত নেই।'

সহসা বৃদ্ধের মুখটি ঝলকে উঠল। খুশির ঝলক। তাড়াতাড়ি বললেন, 'হক কথা বলেছেন। আমরা অনেক কিছু অনুভব করি কিন্তু আপনার মতন করে বলতে পারি না।'

আমি বললাম, 'আমাকে তুমি করে বললে খুব ভালো লাগবে।'

'বেশ বেশ বাবা, তাই বলব। তোমাকে দেখে অবধি খালি মনে হচ্ছে, সাক্ষাৎ দেবদূত। কথা শুনে মনে হচ্ছে, বড় দার্শনিক।' বৃদ্ধর মুখে হাসি, স্বরে প্রসন্নতা।

আমি বললাম, 'আমি দেবদূতও নই, দার্শনিকও নই—আমি একজন সাধারণ মানুষ। এখন আমার ভোগের শুভযোগ চলছে। শুনেছি, রেসের মাঠ সর্বগ্রাসী। এ যাবৎ বিশ-পঁচিশ লাখ চলে গিয়েছে। কে বলতে পারে, ভবিষ্যতে ভিখিরির দশা হবে না!'

'বোলো না, বোলো না বাবা, ওকথা মুখে আনতে নেই'—বৃদ্ধর স্বর বেদনার্ত, 'ঈশ্বর তোমায় রক্ষা করুন।'

সঙ্গী ভদ্রলোক অপার বিস্ময়ে বললেন, 'কুড়ি-পঁচিশ লাখ আপনার চলে গেছে! আপনার তো মশাই অসাধারণ স্ট্যামিনা!'

আমি বললাম, 'আবার দেখুন, আজ সবকটা রেস জিতেছি। 'জ্যাকপট' পেয়েছি। এ এমন একটা থ্রিল—যা টাকা দিয়ে কেনা যায় না। টাকা তো সবকিছু কেনার জন্য সরকারের ছাপ মারা কাগজ ছাড়া কিছু নয়—কিন্তু তা দিয়ে আপনি কি সত্যিই সবকিছু কিনতে পারবেন? পারবেন, একটা নিষ্প্রাণ শরীরে প্রাণ ফিরিয়ে আনতে? পারবেন, শোকস্তব্ধ একটা মানুষের মুখে হাসি ফোটাতে? পারবেন, মেঘলা আকাশে মুহূর্তে আলো ফোটাতে? বা দুর্ঘটনাগ্রস্ত একটা প্লেনকে ক্র্যাশ থেকে রক্ষা করতে? সারা পৃথিবীর সম্পদ এক করলেও পারবেন না।'

বৃদ্ধ হাত বাড়িয়ে আমার একটা কাঁধ চেপে ধরলেন। বললেন, 'তুমি মানুষ নও, বাবা। আসলে তুমি মানুষরূপী দেবতা! তোমার পায়ে মাথা রাখতে ইচ্ছে করছে।'

আমি বৃদ্ধের হাতের ওপর হাত চেপে বললাম, 'ছি ছি, একি বলছেন! আপনি আমার বাবার মতন!'

সঙ্গী মহিলাটি তৎক্ষণাৎ চোখে আঁচল চাপা দিলেন। বৃদ্ধ ফুঁপিয়ে উঠে বললেন, 'বেঁচে থাকো বাবা—' গলা ডুবে গেল ওঁর।

গাড়ি টালা ব্রীজে উঠছে। আমি সঙ্গী ভদ্রলোককে বললাম, 'আপনি একটু বলে দেবেন ড্রাইভারকে।'

ভদ্রলোক বললেন, 'হ্যাঁ—নিশ্চয়ই।'

প্রধান রাস্তা ছেড়ে অনেক এঁদো পোড়ো আর গলি-ঘুঁজি পেরিয়ে যেখানে পৌঁছলাম, সেখানে গাড়ি এগোবার আর জায়গা নেই।

ভদ্রলোক বললেন, 'আমাদের এখানেই নামতে হবে। গাড়ি আর যাবে না। মিনিট খানেক হাঁটতে হবে।'

আমি বললাম, 'নো প্রবলেম।'

বৃদ্ধ বললেন, 'সে তো বুঝতেই পেরেছি, বাবা। তোমাকে এখানে আনার ব্যাপারে প্রথম প্রথম একটু কিন্তু কিন্তু করেছিলাম, তোমার কথার তোড়ে সে-অস্বস্তি ধুয়ে-মুছে গেছে।'

আমি বললাম, 'আমার গাড়িতে এক বোতল বিলিতি তাড়ি আছে। ভদ্র ভাষায় যাকে বলে স্কচ। আপনাদের আপত্তি না থাকলে ওটা সঙ্গে নিতে পারি।'

বৃদ্ধ এবং ভদ্রলোক ভদ্রমহিলার দিকে তাকালেন। অর্থপূর্ণ জিজ্ঞাসা। সম্মতির প্রশ্ন।

ভদ্রমহিলা বললেন, 'আপনি যেটাকে তাড়ি বা স্কচ বলছেন, আপনার হাতের ছোঁয়া পেলে ওটাই আমাদের কাছে গঙ্গাজল বা ঈশ্বরের চরণামৃত হয়ে যাবে। নির্দ্বিধায় আপনি নিয়ে নিতে পারেন।'

বৃদ্ধ খুশি হয়ে বললেন, 'যা বলেছিস সুধা-মা। একেবারে আমার মনের কথাটাই তোর মুখ দিয়ে বেরিয়েছে।'

আমি স্কচের বোতল আর সেলুলার ফোনটা সঙ্গে নিয়ে ওঁদের সঙ্গে সঙ্গে চললাম। পাঁচ-ছ ফুট চওড়া আঁকা-বাঁকা কাঁচা মাটির পথ ধরে আমরা এগোচ্ছি। দু-পাশে ঘিঞ্জি টালি-খোলা আর টিনের ছাউনি দেওয়া ছ্যাঁচা-বেড়ার ঘর। কেরোসিনের কুপি, কোথাও-বা শিব ওঠা কালো-চিমনির হ্যারিকেন জ্বলছে। মানুষগুলোকে ঠিকমতো দেখা যায় না। অনেকটা প্রেতাত্মার মতন, একটা ভুতুড়ে স্তব্ধতা যেন গ্রাস করে আছে গোটা চত্বরটাকে। পথটা শেষ হয়ে গেল। সামনে খানিকটা খোলা জমি। চারপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে কিছু চালাঘর। ছিটেবেড়ার দেওয়ালের ওপর টালি-খোলার ছাউনি। কাঠের ফ্রেমে টিনের দরজা। চার ফুট চওড়া মাটির দাওয়া ডিঙিয়ে একটা ঘরের সামনে এসে সুধা দরজার তালা খুললেন। ভেতরে ঢুকে আলো জ্বালালেন। হ্যারিকেন। দাওয়ার বাঁ দিকে একটা খুপ্‌রি। সম্ভবত রান্নার জায়গা। আমরা দাওয়ায় জুতো খুলে ভেতরে ঢুকলাম। মাটির মেঝে। ঘরটা টেনেটুনে আট বাই দশ। বাঁদিকে একটা চৌকি, মাদুর পাতা। বিছানাটা গোটানো, একপাশে রাখা। সুধা আমাদের চৌকিটা দেখিয়ে বসতে বললেন। আমি বললাম, 'মেঝেয় কিছু একটা পেতে দিন, সবাই মিলে বসা যাবে।'

সুধা একটা শতরঞ্চি পাতলেন মেঝেয়। আমরা তিনজন সেখানে বসলাম। আমি বললাম, 'চারটে গেলাস আর খানিকটা জল দিন। আগে আমরা শুরু করি। তারপর আলাপ পরিচয় করা যাবে।'

সুধার সংসারে কাচের গ্লাস মাত্র দুটো। বৃদ্ধ পকেট থেকে চাবি বের করে সুধাকে দিয়ে বললেন, ওঁর ঘর থেকে দুটো গ্লাস আনতে। গ্লাস এসে গেল। আমি চারটি গ্লাসে হুইস্কি ঢেলে, অ্যালুমিনিয়ামের ঘটি থেকে

পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে চামেলি আত্মহত্যা করল বিষ খেয়ে

জল ঢাললাম। সুধা তখন ঘরের বাইরে। আমরা তিনজন গ্লাসে চুমুক দিলাম। সুধা একটা কলাইয়ের থালায় কিছুটা চানাচুর আর কয়েকটা নোন্‌তা বিস্কুট নিয়ে ঘরে ঢুকলেন। আমাদের সামনে থালাটা রেখে আবার বাইরে যেতে উদ্যত হলেন। আমি বললাম, 'আপনি বসুন আমাদের সঙ্গে।'

সুধা বললেন, 'আপনারা শুরু করুন। আমি আসছি একটু বাদে।' উনি বেরিয়ে গেলেন। এই বইটি www.boiRboi.blogspot.com থেকে ডাউনলোডকৃত।

আমি বললাম, 'আমরা এতক্ষণ অনেক কথা বলেছি কিন্তু কারো নাম জানার প্রয়োজন হয়নি। আমার নাম তড়িৎ সিন্‌হা।' আনুষ্ঠানিক পরিচয়ের ভঙ্গিতে হাত-জোড় করলাম আমি।

বৃদ্ধ বললেন, 'আমার নাম হীরেন নাগ', ভদ্রলোককে দেখিয়ে বললেন, 'ও হচ্ছে শৈল, শৈলেশ্বর গাঙ্গুলি।'

হাত-জোড় বিনিময় হল। আমি বললাম, 'সুধা দেবী নিশ্চয়ই শৈলবাবুর স্ত্রী?'

বৃদ্ধ হীরেন নাগ বললেন, 'সবাই অবশ্য তা-ই জানে। আসলে ওরা স্বামী-স্ত্রী নয়। ওরা থাকে একসঙ্গে।'

আমি একটু ধাক্কা খেলাম। হীরেন আবার বললেন, 'সুধা আর শৈলর ভুল জায়গায় বিয়ে হয়েছিল। সেই ভুল ভাঙার পর ওদের পরিচয় ও সহচারণ। দু-ঘর পাশেই আমার ঠাঁই। আমিই ওদের এই বস্তিতে নিয়ে আসি। তা দেখতে দেখতে প্রায় বছর পাঁচেক হয়ে গেল।'

একটু একটু করে আমাদের গ্লাস খালি হচ্ছে। আমি বললাম, 'মাঠে যাওয়ার ব্যাপারটা বলুন।'

হীরেন বললেন, 'বছর কুড়ি আগে শৈলর সঙ্গে আমার পরিচয় হয় রেসের মাঠে। তখন শৈল বছর তিরিশের যুবক। বাড়িতে ওর ছ বছরের পুরনো বউ আর পাঁচ বছরের একটি মেয়ে।' শৈলকে একটা মৃদু খোঁচা দিয়ে বললেন, 'তুমি বলো না হে, শৈল। অবশ্য আমিও বলব।'

শৈল বললেন, 'হ্যাঁ, তখন মোটামুটি আমার সুখের জীবন। বিয়েতে মোটা টাকা যৌতুক পেয়েছিলাম। সওদাগরি অফিসের দশটা-পাঁচটা ছেড়ে ব্যবসা শুরু করেছিলাম। বড়লোক শ্বশুর শোভাবাজারে একটা বাড়ি লিখে দিয়েছিল বউ-এর নামে। সেই বাড়ির একতলায় অনেকটা জায়গা খালি

পড়েছিল। সেই জায়গাটাকে সংস্কার করে গো-ডাউন আর অফিস বানালাম। সওদাগরি অফিসে কাজের অভিজ্ঞতা আর যোগাযোগটাকে কাজে লাগিয়ে সিমেন্ট, পি-ভি-সি রেনওয়াটার পাইপ, গ্যালভানাইজড্ ওয়াটার পাইপ, স্যানিটারিজ ও গ্লেজড্ টাইলস-এর ডিলারশিপ নিয়ে বসে গেলাম। অল্পদিনের মধ্যেই ব্যবসা জমে গেল। লাভের খাতায় মোটা টাকা জমতে শুরু করল। কিন্তু যেহেতু শ্বশুরের জায়গা ও টাকায় ব্যবসা, বউ তদারকি শুরু করে দিল। ওই বাড়িরই ওপরতলায় বাস, অতএব যখন-তখন বউ নেমে এসে অফিসে বসতে শুরু করল। কিছুদিন পরে বউয়ের মামাতো ভাই অর্থাৎ আমার বাবাকেলে মামাতো শালা—সে-শালাও এসে বসতে শুরু করল। আমার ভূমিকাটা হয়ে উঠল অনেকটা চাকর-বাকরের মতন। মালপত্তর আনা-নেওয়া, গোডাউনের তদারকি করা, কুলিদের হিসেব রাখা—এইসব ফালতু কাজের ভার পড়ল আমার ওপর। আমি উৎসাহ হারাতে শুরু করলাম। বাড়ির চাইতে বাইরের টান আমার বাড়তে লাগল। মাসকাবারে ঠিক মাইনের মতন কিছু টাকা বউ আমার হাতে দিত। সেই টাকাটা বাংলা মদের দোকান, ধূমপান এবং আনুষঙ্গিক খরচে ব্যয় হয়ে যেত। বিপথগামী সঙ্গী-সাথী জুটতে শুরু করল। এইরকম একটা সময়েই একদিন রেসের মাঠে হাজির হলাম।'

সুধা ঘরে ঢোকায় ছেদ পড়ল। কাঁচালঙ্কা টেপা গরম গরম মাছের ডিমের বড়া ভর্তি একটা থালা বসিয়ে দিলেন আমাদের সামনে। সুধার পানীয় ভর্তি গ্লাসটা আমি ওঁর হাতে ধরিয়ে দিয়ে বললাম, 'এবার বসুন তো। তখন থেকে শুধু শুধু ব্যস্ত হচ্ছেন আমাদের জন্যে।'

সুধা আমার পাশে বসতে বসতে বললেন, 'ব্যস্ত আর কি! ঘরে যা ছিল, তা-ই একটু করে দিলাম।'

আমি একটা বড়া মুখে পুরে দিয়ে বললাম, 'চমৎকার!' শৈল আমার মুখোমুখি। ওঁকে বললাম, 'নিন, শুরু করুন।'

শৈল বড়া খেতে খেতে বলতে শুরু করলেন, 'রেস খেলার চেয়ে মাঠের পরিবেশ আমাকে বেশি আকর্ষণ করল। সঙ্গী-সাথীদের পরামর্শ মতন একটা দুটো বাজি ধরতাম। হারা-জেতার চেয়ে উত্তেজনাটাই বেশি

উপভোগ করতাম। একটু একটু করে রেসের মাঠের আকর্ষণ বাড়তে শুরু করল।

'ব্যবসা পত্তর তখন বেশ বাড়-বাড়ন্ত। আমি আর কিছুই দেখি না। সারাটা দিন বাইরে বাইরেই কেটে যায়। একটা উদ্দেশ্যহীন জীবন আমাকে গ্রাস করতে শুরু করেছে। একটা ব্যাপার লক্ষ্য করলাম—আমার এই ধরনের জীবনযাপনের বিরুদ্ধে কারো কোনও অভিযোগ ছিল না। রাতে বাড়ি না ফিরলেও কাউকে কোনও কৈফিয়ৎ দিতে হত না। সবচেয়ে বেশি আশ্চর্য হলাম—আমার মাসকাবারী টাকা বাড়িয়ে দেওয়ায়। যখন তখন হাত পাতলেই বউ টাকা দিয়ে দেয়। আমি একটি গৃহপালিত মানুষে পরিণত হলাম। এই সময়েই হীরেনদার সঙ্গে মাঠে পরিচয়—'

'দাঁড়াও'—হীরেন বাধা দিলেন, 'তুমি একটা ব্যাপার চেপে যাচ্ছ শৈল, সেটা আমিই বলে দিচ্ছি।'

শৈল গ্লাসে চুমুক দিয়ে মাথা নিচু করলেন। সুধাও পান শুরু করেছেন। আমার গ্লাস খালি হয়ে গিয়েছিল। পানীয় ঢেলে জল মিশিয়ে নিলাম।

হীরেন বললেন, 'শৈল তখন বাড়ি না ফিরলেই বউ খুশি হত। কারণ, তখন ওই পাতানো মামাতো ভাই শৈলর বেডরুমের দায়-দায়িত্ব নিয়ে নিয়েছে। শৈলর বউ তখন তাকে নিয়েই শোয়। ব্যাপারটা শৈলর নিজের চোখে দেখা। কী, শৈল—?'

শৈল বললেন, 'হ্যাঁ। সে বড় লজ্জার কথা। একদিন দুপুরে—থাক, এটা আর না-ই বা বললাম। ব্যাপারটা তো পরিষ্কার। আসলে, পরপুরুষে আসক্তির জন্যেই বউ আমাকে টাকা-পয়সা দিতে কুণ্ঠা বোধ করত না। বাড়িতে আমার শোবার ঘরও আলাদা হয়েছিল। যাই হোক, হীরেনদার সঙ্গে আলাপ-পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গেই সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হচ্ছিল। হীরেনদা এমন একটা মানুষ—'

বাধা দিলেন হীরেন। বললেন, 'ওটা আমাকেই বলতে দাও। দেখ বাবা তড়িৎ, আমার জীবনটা বড়ই বিচিত্র। বিয়ে-থা আমার কপালে লেখা ছিল না। তার মানে এই না যে, আমার জীবনে নারী আসেনি।'

সুধা গ্লাস শেষ করে মেঝেয় রাখলেন মৃদু ঠুকে। হীরেন বললেন, 'ওকে আগে দাও, তারপর বলছি।'

আমি সুধার গ্লাসে পানীয় ঢেলে জল মিশিয়ে দিলাম। হীরেন শুরু করলেন, 'গত পঞ্চাশ বছর ধরে রেসের মাঠ আমার জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। কাজ করতাম এক বুকমেকারের অফিসে। মাঝে মাঝে মাঠের কাউন্টারেও বসতে হত। থাকতাম একটা মেসে। এক-আধদিন মওকা বুঝে, ফেভারিট ঘোড়ার টিপ্‌স্‌ পেয়ে কিছু টাকা লাগিয়ে দিতাম। এবং অবধারিত ভাবেই টাকাটা কয়েক গুণ বেড়ে ফিরে আসত। একটু একটু করে আমি ঘোড়ার নেশায় মেতে উঠছিলাম। আর একটা নেশাও আমাকে টানছিল। মালিকের একজন রক্ষিতা ছিল। কতজন ছিল, আমি সঠিক বলতে পারব না। যার কথা বলছি, তাকে আমি মাঠেই দেখেছি। সুন্দরী, স্বাস্থ্য দীপ্তিময়ী। নিয়মিত ঘোড়ায় বাজি লাগাত। জিততও। মহিলাটির নাম চামেলি। চামেলির টান অনুভব করতাম সব সময়। ও আমাকে প্রশ্রয় দিতে শুরু করল। মেলামেশা শুরু হল আমাদের একান্ত গোপনে। মালিক ওকে নিয়ে পুতুল খেলত, আর আমার সঙ্গে ওর খেলা জীবনের সঙ্গে জড়াতে শুরু করল। মানসিক এবং দৈহিকভাবে আমরা পরস্পরকে ভালোবেসে ফেললাম। সেই সময়—দাঁড়াও, গ্লাসটা খালি হয়ে গেছে—একটু দাও, তারপর বলছি।'

আমি হীরেনের গ্লাসে পানীয় ঢেলে জল মিশিয়ে দিলাম। সিগারেট ধরিয়ে অধীর আগ্রহে ওঁর দিকে তাকালাম। গ্লাসে চুমুক দিয়ে উনি আবার বলতে শুরু করলেন, 'হ্যাঁ, সেই সময় চামেলির পেটে একটি বাচ্চা আসে। চামেলি জানত, বাচ্চাটি আমার। কিন্তু মালিককে ও সে-কথা জানাল না। মালিক জানল, তারই সন্তান এসেছে চামেলির গর্ভে। মালিক চামেলিকে খালাস করতে বলল। কিন্তু চামেলি রাজি হল না। ও আমার সঙ্গে পরামর্শ করল। শেষ পর্যন্ত ঠিক হল, আমার সন্তানের দায়িত্ব আমিই নেব। আমি মেস ছেড়ে চামেলিকে নিয়ে একটা বাসা ভাড়া করলাম। মালিক ধরে নিল, চামেলি পালিয়েছে। যথাসময়ে চামেলির একটি মেয়ে হল। দিনে দিনে চামেলি আর আমি মেয়ের মায়ায় জড়াতে শুরু করলাম।

'একবার অসুস্থতার দোহাই দিয়ে আমি দুদিন অফিস গেলাম না। মেয়েকে নিয়ে আমি ঘরে রইলাম। চামেলি মাঠে গেল। মালিকের সঙ্গে দেখা

হল। মালিক ওর পুনর্দর্শন পেয়ে খুবই পুলকিত হল। চামেলি অবশেষে মালিককে জানাল, সন্তানটি ধরে রাখার জন্যই ও অন্তর্হিত হয়েছিল। সন্তান নিয়ে এখন সে তার এক আত্মীয়ের আশ্রয়ে আছে। মালিক তার সন্তানের মুখ দেখার জন্য ব্যাকুল হল। ঠিক হল, মালিকের পুরনো আশ্রয়েই আগের মতন চামেলি তার মেয়েকে নিয়ে থাকবে, কিন্তু ব্যাপারটা পাঁচ কান না হয়।

'ফলে চামেলি মেয়েকে নিয়ে ফিরে গেল মালিকের পুরনো আশ্রয়ে আর আমি আবার ফিরে গেলাম মেসে। মেয়ের পাঁচবছর বয়সে মালিক একটি আবাসিক শিক্ষায়তনে পাঠিয়ে দিল। সেখানে মেয়ে বড় হতে লাগল। আমি লুকিয়ে চুরিয়ে চামেলির সঙ্গে দেখা করতাম। মেয়েকেও আমরা দেখতে যেতাম মালিককে না জানিয়ে।'

আমি লক্ষ্য করলাম, সকলেরই গ্লাস খালি। সবকটি গ্লাসেই পানীয় ঢালতে সুধা জলপূর্ণ করে দিলেন। হীরেন আবার শুরু করলেন, 'পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে চামেলি আত্মহত্যা করল। বিষ খেয়ে। মেয়ের বয়স তখন দশ। সুইসাইডাল নোটে চামেলি লিখেছিল : আমি একজনকে ভালোবাসি। তার সঙ্গে আর প্রতারণা করতে পারছি না। এখন মৃত্যুই আমার একমাত্র কাম্য। আমার মেয়ের দায়িত্ব যেন আমার প্রেমিকের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

'খবরটা কাগজেও বেরিয়েছিল। কিন্তু মালিকের কাছে আমি স্বীকার করতে পারলাম না যে, আমিই চামেলির প্রেমিক। কাগজটা যত্ন করে রেখে দিলাম। চামেলির বিরহে আমি খুবই কাতর হয়েছিলাম। আবার মেয়ের জন্যও দুশ্চিন্তা বেড়ে গেল। সে জানল, তার মা মারা গেছে। আমার কাছেই জেনেছিল। কেননা, সে তার মা ছাড়া শুধু আমাকেই চিনত। মালিককে কোনওদিন চোখে দেখেনি। ছোটবেলায় দেখলেও ভুলে গিয়েছে।

'মেয়ের খরচের টাকাটা মালিকই পাঠাত। কিন্তু আমি অনুভব করলাম, মেয়ে আমার বেওয়ারিশ হয়ে যাচ্ছে। সে বড় হচ্ছে। তার মাথায় নানান প্রশ্নের জট পাকাবে এবার। অনেক ভেবে-চিন্তে আমি সিদ্ধান্ত নিলাম।

চামেলি যখন মারাই গেছে তখন আর ভয়টা কিসের! যা হবার হবে। বড় জোর মালিক আমায় চাকরি থেকে বরখাস্ত করতে পারে। যা আছে কপালে ভেবে সরাসরি মালিককে সব বলে দিলাম। সব, অকপটে।

'ফল হল উল্টো। মালিক যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। বলল, হীরেন, তোমাকে আমি মোটা টাকা দেব, তুমি মেয়ের পিতৃত্ব স্বীকার করো। এখন থেকে তুমি মেস ছেড়ে ভালো জায়গায় বাড়ি নাও। তোমাদের সব দায়িত্ব আমি নেব। চামেলির কসম, ও চলে যেতে আমি খুবই আঘাত পেয়েছি। আরও অনেক আগে তোমার সব কথা বলা উচিত ছিল।

'ষোলো বছর বয়সে মেয়ে স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা দিল। ইতিমধ্যে আমি একটি বাসা পেয়ে গেলাম রাজবল্লভপাড়া অঞ্চলে। মেয়েকে হস্টেল থেকে নিজের কাছে নিয়ে এলাম। সব রকম কাজের জন্য একজন মাঝবয়সী মহিলাকে রাখা হল সারাদিনের জন্য। মেয়ে মাকে ছাড়া আমাকেই চিনত। অতএব তার বাবাকে চিনে নিতে কোনও অসুবিধা হয়নি।

'যথা সময়ে মেয়ের রেজাল্ট বেরুল। ফল খারাপ হয়নি। ভালোভাবেই পাশ করেছে। কাছেই মনীন্দ্রনাথ কলেজের মর্নিং সেশনে মেয়েকে ভর্তি করে দিলাম। গতানুগতিকভাবে দিন কেটে যাচ্ছিল। বছর দুয়েকের মধ্যেই মেয়ে প্রস্তাব দিল, সে একটি ছেলেকে ভালোবেসেছে, বিয়ে করতে চায়। মালিককে সব কথা বললাম। মালিক বিয়ের ব্যবস্থা করতে বলল। আর্থিক দায়-দায়িত্ব নিল মালিক। মোটামুটি ভালোভাবেই মেয়ের বিয়ে হয়ে গেল। কিন্তু বিয়ের সুখ মেয়ের কপালে সইল না। বি.এ. পাশ জামাই আমার গাড়ি চালাত স্থানীয় এম.এল.এ.-র। বম্বে রোডে এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারায় আমার জামাই এবং এম.এল.এ.-সহ আরও দুজন। মেয়ে শাঁখা ভেঙে, সিঁদুর মুছে আবার ফিরে এলো আমার কাছে। অপয়া হিসেবে তার শ্বশুরবাড়ি তাকে বাতিল করেছে।'

হঠাৎ ফুঁপিয়ে উঠলেন সুধা। আঁচলে মুখ চেপেও কান্নার বেগ সামলাতে পারলেন না। বাঁধ ভেঙে গেল। সেই কান্না হীরেনকেও গ্রাস করল। হীরেন দু-হাতে মুখ ঢেকে ফোঁপাতে লাগলেন। স্বল্প আলোয় শৈলকে দেখলাম। তাঁর দৃষ্টি শূন্য, উদাস। মনে হল, তিনি এ জগতেই নেই। আমি মৃদু

ধাক্কা দিলাম ওঁকে। উনি ধীরে ধীরে আমার দিকে তাকালেন। একটা যুগ থেকে যেন ফিরে আসছেন উনি।

হীরেন নিজেকে কিছুটা সামলে নিলেন। তারপর ভাঙাচোরা গলায় বললেন, 'শ্বশুরবাড়ি থেকে সুধা ফিরে আসার পর—'

আমি বাধা দিয়ে বললাম, 'এক মিনিট—'

হীরেন বললেন, 'হ্যাঁ, সুধাই আমার সেই মেয়ে।'

আমার ভেতরটা মুচড়ে উঠল। সেটা সামাল দিতে গ্লাসটা ঢেলে দিলাম গলায়। নিস্তব্ধ শীতের রাতের একটা নিজস্ব তন্ময়তা আছে। আমরা কেউ কোনও কথা বলছি না। হঠাৎ যেন সবাই বোবা হয়ে গিয়েছি। নীরবতা মুহূর্ত গুনছে শুধু।

আমি সকলের গ্লাসে পানীয় দিতে শুরু করলাম। গ্লাসগুলো জলপূর্ণ করে দিয়ে নীরবে সিগারেট ধরালাম। হীরেন বললেন, 'সুধা-মা, তুই দু-মুঠো চাপিয়ে দে। তড়িৎ বলেছিল, এদিকে নাকি ওর কী কাজ আছে! ওটা আসলে ভনিতা। আজ না-হয় আমাদের সঙ্গে আলু সেদ্ধ আর ফ্যান-ভাত খেয়েই বাড়ি ফিরবে।'

আমি কোনও জবাব দিলাম না। মনে মনে ভাবলাম, রেসের মাঠে দেখা এই তিন প্রাণীর সঙ্গে একসাথে অমৃতর ভাগ পাওয়ার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হব কেন!

সুধা উঠে পড়লেন। আমরা সবাই গ্লাসে চুমুক দিলাম। হীরেন বললেন, 'সুধা ফিরে আসার পর ওকে সমস্ত কথা বলে দিলাম। চামেলির কথা, মালিকের কথা, আমার নিজের কথা—স-ব বলে ফেললাম ওকে। নিজের সাম্প্রতিক বিপর্যয় আর অতীত জীবনের সব কথা শুনে ও কেমন যেন এক শূন্যতায় বিলীন হয়ে গেল। এর বছরখানেক পরে আমি রিটায়ার করলাম। তখন সুধার বয়েস কুড়ি। শৈলর সঙ্গে পরিচয় হল মাঠে। দ্রুত ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠলাম ওর সঙ্গে। অকপটে ও সব-হারানোর কথা বলে যায় আমাকে। বাকি কাহিনী শৈলর মুখেই শোনো। বলো না হে, শৈল।'

শৈল শুরু করলেন, 'রিটায়ার করার পরেও হীরেনদা রেসের মাঠ ছাড়তে পারেননি। আমার সঙ্গে পরিচয় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই খুব আপন করে নিয়েছিলেন। আমারও মনে হয়েছিল, যেন কতকালের চেনা। হীরেনদা

রোজ খেলতেন না। মাঝে মধ্যে খেলতেন এবং অবধারিত জিততেন। আমাকে দু-একটা টিপস্ দিতেন কুইনেলা, টানালায়—বেশিরভাগই জিততাম।

'হীরেনদাকে এতটাই আপনজন মনে হয়েছিল যে, নিজের ব্যক্তিগত জীবনের সব কথা মুখ দিয়ে বেরিয়ে যেত। তখনও জানতাম হীরেনদা একা মানুষ—অকৃতদার। হীরেনদা জানতেন, আমার জীবন ছন্নছাড়া। কোথায় যাব, কোথায় শোব—কোনও ঠিক নেই। টাকার দরকার হলে বাধ্য হয়ে বউয়ের দ্বারস্থ হই—নচেৎ মুখদর্শন করতে ইচ্ছে হয় না। একদিন হীরেনদা আমাকে ওঁর আশ্রয়ে নিয়ে যেতে চাইলেন। সেদিন হীরেনদার টিপ্স্ পেয়ে আটশো টাকা জিতেছি। আমি এক কথাতেই রাজি। হীরেনদার অনুমতি নিয়ে মোগলাই খানা আর একটা বড় রামের বোতল নিয়ে নিলাম। তখনও সুধার কথা ঘুণাক্ষরেও কিছু জানি না।

'হীরেনদা বাসায় পৌঁছে দরজার কড়া নাড়তেই একজন যুবতী দরজা খুলে দিল। আমি বেশ অবাক হয়ে গেলাম। ভেতরে ঢুকতে ঢুকতে হীরেনদা যুবতীটিকে বললেন, সুধা, আজ আর রান্নাবান্না করতে হবে না। তুই এসে আমাদের সঙ্গে বোস।

'আমি কোনওরকম কৌতূহল দেখালাম না। আজকের মতোই সেদিন আমরা মেঝেয় মাদুর পেতে বসেছিলাম। সুধা মদ খায়নি।'

'হ্যাঁ, খেয়েছিলাম, পরে,' সুধার প্রবেশ ও জবাব, 'কিন্তু না, আমি এখন এখানে থাকব না। বিশ বছর আগের সেইসব কাঁচা প্রেমের গল্প তোমাকে আর রসিয়ে রসিয়ে বলতে হবে না। গ্লাসটা নিতে এলাম। পনেরো মিনিট পরে খাবার দেব। তোমরা তাড়াতাড়ি শেষ করো।' গ্লাস নিয়ে সুধা বেরিয়ে গেলেন।

শৈল বললেন, 'হ্যাঁ, পরে খেয়েছিল শুধু আমার সঙ্গে। আমরা যখন হীরেনদার ঘরে পান শুরু করলাম, সুধা তখন আমাদের সঙ্গে বসেনি। ও জানালায় দাঁড়িয়েছিল নিজের মনে। হীরেনদা আমাকে একজন দুঃখী মেয়ের কাহিনী শোনাচ্ছিলেন। কাহিনীটি বড়ই করুণ। শুনতে শুনতে চোখ ভেসে যায়। পরে উনি সুধাকে ডেকে পরিচয় করিয়ে দিলেন। জানালেন, এ-ই সেই হতভাগিনী। সুধার চোখে তখন মুক্তো টলটল করছিল। আমি

হীরেনদার সামনেই ওকে আমার বুকে টেনে নিই। এতটুকু দ্বিধা বা সঙ্কোচ ছিল না।'

হীরেন বললেন, 'আমার মনে হয়েছিল, দুটো সর্বহারা মানুষ, যাদের জীবনের কোনও নির্দিষ্ট লক্ষ্য নেই, তারা দুজনে দুজনের ওপর ভার রেখে যদি বাকি জীবনটা কাটাতে পারে, শর্তহীন স্বার্থহীন বোঝাপড়ায়—তাহলে বোধহয় ভালোই হবে।'

শৈল বললেন, 'সেদিন রাতে ইচ্ছে করে হীরেনদা উধাও হয়ে গেলেন। সুধা আমাকে আঁকড়ে ধরল, আমি ওকে। আমরা সেদিন কেউই ঘুমোইনি। সারারাত দুজনে মুখোমুখি বসে পরস্পরের চোখের জল মুছিয়ে দিয়েছিলাম।

'দুদিন পরে হীরেনদা ফিরে এলেন। নিজের আলাদা থাকার ব্যবস্থা আর আমার জন্য একটি কাজের ব্যবস্থা পাকা করে এসেছেন। ষাট বছর বয়সে হীরেনদা একা একা থাকবেন—এটা সুধা আর আমি মেনে নিই নি। কিন্তু হীরেনদা আমাদের কথায় কান দিলেন না। উনি নিজের জন্য ব্যবস্থা করেছিলেন একটি তিন-তারা হোটেলে। হোটেল-মালিকের গোটা কুড়ি ঘোড়া রেসের মাঠে দৌড়ত। হোটেলের হাল্‌কা কাজকর্ম ছাড়াও রেসের মাঠে কিছু কিছু কাজের দায়িত্ব পালনের বিনিময়ে উনি নিখরচায় থাকা-খাওয়া ও মাস মাইনের যা পাবেন—সেটা যথেষ্ট ভালো বলেই মনে হল। আমার ব্যবস্থা করেছিলেন এক বুকমেকারের অফিসে, হিসেবপত্তরের কাজ। যা মাইনে, তাতে ঘরভাড়া দিয়ে দুটি মানুষের অনায়াস দিনযাপন সম্ভব।

'তিনজনের জীবনই নতুন বাঁক নিল। আমাদের পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল নিয়মিত। ভালো টিপস্ পেলে আমরা সুধাকে দিতাম। ও খেলত এবং জিততও। সেই সময় রেসের মাঠের উপার্জনটা ছিল অতিরিক্ত। টাকাগুলো সুধা জমাত। এভাবে কেটে গেল দু-বছর।

'সুধা মাঠে অভ্যস্ত ও পরিচিত হয়ে উঠেছিল। রেসের মাঠে অনেক মেয়ে ঢুকত, যারা প্রধানত দেহোপজীবিনী। সোনাগাছি থেকেও অনেক মেয়ে আসত শাঁসালো বাবু ধরবার জন্যে। হাফগেরস্ত ও মধুচক্রের ঠেক থেকেও মেয়ে আসত। কাউকেই দেখে বোঝা যেত না, আগমনের উদ্দেশ্য কী। দামী পোশাক আর সাজগোছের আড়ালে আসল উদ্দেশ্য ঢাকা পড়ে

যেত। সুধার সঙ্গে একটি মেয়ের ঘনিষ্ঠতা হয়। সুধা ভাবতেও পারেনি, মেয়েটি সোনাগাছির এক অভিজাত গণিকালয়ের সম্রাজ্ঞী। বিশাল বিস্তৃতি তার চরাচরের। পরনারী আসক্ত প্রচুর বিত্তবান পুরুষকে সে নিত্যনতুন মেয়েমানুষ যোগান দিত। সেইসব বিত্তবান পুরুষদের মধ্যে বেশিরভাগই পারভার্ট, বিকৃত কামে অভ্যস্ত।

'মেয়েটি প্রথমে সুধার সঙ্গে ভাব জমিয়ে ওর বিস্তারিত খবরাখবর সব জেনে নেয়। ওর বাবা অর্থাৎ হীরেনদা কী করেন, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব জানতে পারে। সুধা স্বামী হিসেবে আমার পরিচয় দেয় এবং আমি কী করি তা-ও জানায় মেয়েটিকে। এরপর মেয়েটি সুধাকে সরাসরি কুপ্রস্তাব দেয় এবং টাকার লোভ দেখায়। জানায়, তার পরিচিত একজন পুরুষ নিয়মিত সুধাকে লক্ষ্য করে এবং সুধাকে তার মনে ধরেছে। যে কোনও মূল্যে সে সুধাকে পেতে চায়। এই সময়েই মেয়েটি তার আসল পরিচয় দেয় সুধাকে এবং জানায় তার সাম্রাজ্যের কথা। বিকৃত কাম কাকে বলে সুধা জানত না। মেয়েটি তাকে বিদেশী ছবির বই দেখায়। ব্লু-ফিল্ম দেখাবে বলে তার ডেরায় আমন্ত্রণ জানায়।

'প্রথমে সুধা এসব কথা আমাকে জানায়নি। ও মাঠে যেতে চাইত না। কারণ জিজ্ঞেস করলে এড়িয়ে যেত। অবশেষে মেয়েটি একদিন দুপুরে রাজবল্লভপাড়ার বাড়িতে গিয়ে হাজির হয়। ওকে টোপ দেয়, লুকিয়ে মেয়েটির ডেরায় যাবার জন্য। বলে, নিয়মিত দুপুরে লুকিয়ে ওর ডেরায় গেলে ভালো রোজগার হবে—কেউ কিছু জানতেও পারবে না। দু-তিন ঘণ্টার বেশি থাকতে হবে না। ও মেয়েটিকে ফিরিয়ে দেয়। তখন মেয়েটি ওকে শাসায়—বলে, ও নাকি হীরেনদা ও আমার ভবিষ্যৎ অন্ধকার করে দিতে পারে। তখন মাথা নিচু করে ওকে মেয়েটির বশ্যতা স্বীকার করতে হবে।

'সেদিন বাড়ি ফেরার পর সুধা কেঁদে কেঁদে আমাকে সব কথা জানায়। আমি শুনে স্তম্ভিত হয়ে যাই। পরের দিন হীরেনদাকে সব কথা জানালাম। হীরেনদা অভিজ্ঞ প্রাচীন মানুষ—জীবনে অনেক কিছু দেখেছেন। উনি বললেন, খোঁজখবর নেবেন। এবার ওঁর মুখ থেকেই বাকিটা শুনুন।' শৈল চুপ করলেন।

হীরেন শুরু করলেন, 'শৈলর মুখে সব শুনে সমস্ত ব্যাপারটা গভীরভাবে ভাবতে শুরু করলাম। রেসের মাঠে গোপন ঘোড়ার খবর আর আনকোরা সতেজ মেয়েমানুষের সন্ধান দেবার জন্য একটা গোপন চক্র কাজ করে। আমি সরাসরি আমার হোটেল ও ঘোড়ার মালিককে সব ব্যাপারটা জানালাম। উনি তিনদিন পরে আমাকে জানালেন, ওঁর গুণধর ছেলেটিই আসলে নাটের গুরু। উনি আরও জানালেন, মাসে দু-একবার গোপনে মেলামেশা করলে কাকপক্ষীও টের পাবে না। একবার যখন গুণধরের মনে ধরেছে তখন তার কবল থেকে রেহাই পাওয়া কঠিন। পুত্রস্নেহে অন্ধ পিতা পুত্রের এই তুচ্ছ বায়নাক্কায় কোনও দোষ দেখেন না। তিনি আমাকে অর্থের লোভ দেখিয়ে মেয়েকে রাজি করাতে নির্দেশ দিলেন। আমি ওঁকে মিথ্যে আশ্বাস দিয়ে মাথা গোঁজার ঠাঁই খুঁজতে শুরু করি। এক সপ্তাহের মধ্যে মাসে দশ টাকা ভাড়ায় এই বস্তিতে ঘর ঠিক করি। মাসকাবারে মাইনে নিয়ে আর ওখানে যাইনি।'

সুধার গলা শোনা গেল, 'আমার কিন্তু হয়ে গেছে। বললেই বেড়ে দেব।'

আমি বললাম, 'একটু বাইরে যেতে হবে।'

শৈল বললেন, 'চলুন, আমিও যাব।'

ঘর থেকে বেরিয়ে জুতোয় পা গলাতে গলাতে সুধাকে দেখতে পেলাম রান্নার ঘুপ্‌চিতে। কেরোসিনের ডিবেয় ওঁর আধো-আলো-অন্ধকার মুখের একপাশ দেখা যাচ্ছে । মোটা ভাতের মেঠো গন্ধ লাগলো নাকে। ক্ষুধার তীব্রতা অনুভব করলাম। দাওয়া থেকে নেমে প্রাকৃতিক কাজ সারার জন্য শৈল আর আমি এগিয়ে গেলাম। যেখানে খুশি দাঁড়িয়ে পড়লেই হল। ঠাণ্ডাটা বেশ উপভোগ্য। প্রাকৃতিক কাজ সেরে সিগারেট ধরালাম।

শৈল বললেন, 'ঘটনার বাকিটুকু আপনাকে বলি। হীরেনদা অনুমান করেছিলেন আমার কাজের মেয়াদও বেশিদিন নেই। বস্তিতে আগেভাগেই একটা ব্যবস্থা করার উদ্যোগ নিচ্ছিলেন। তখন আমি চক্রের শিকার। আর সুধা তো তার হাঁড়ির খবর পর্যন্ত দিতে বাকি রাখেনি মেয়েটির কাছে। মাসখানেক পরেই আমার ডাক পড়ল বড়বাবুর ঘরে। বড়বাবু সরাসরি আমাকে জিজ্ঞেস করল, আমি কাজটা পাকা করতে চাই কিনা। কে আর

না চায়! আমি সম্মতি জানাতে বড়বাবু জানাল, সামনের মাস থেকে আমাকে পাঁচশো টাকা বেশি দেওয়া হবে শর্তসাপেক্ষে। হীরেনবাবুর মেয়ে সুধাকে—বুঝতেই পারছেন—সেই এক টোপ। সে-মাসের মাইনে নিয়ে আমি কাজে ইস্তফা দিলাম। ঘর ছেড়ে সুধাকে নিয়ে উঠলাম এখানে। তখন থেকে আমরা সবাই বেকার। হাতে কিছু টাকা ছিল। এক সময় সেটাও তলানিতে এসে ঠেকল। তখন আমাদের কাছে খোলা একমাত্র রেসের মাঠ। রেসের মাঠকে ভরসা করেই আমাদের দিনযাপন। ঘোড়া ছুটবে, তার হারজিতের ওপর নির্ভর করে আমাদের দু-মুঠো অন্ন, লজ্জা নিবারণের মোটা কাপড় আর আকাশের নিচে এক চিলতে ছাউনি। প্রায় আঠারো বছর আমরা বেঁচে আছি ঘোড়ার ভাগ্যের ওপর। এখন ঘোড়াই আমাদের কাছে ভগবান।'

রেসের মাঠকে জীবিকা করে তিনজন মানুষ টিকে আছে, ভাবতে অবাক লাগে! এরকম অনিশ্চিত জীবনযাপনের কথা ভাবা যায়! জিজ্ঞেস করলাম, 'যখন রেস বন্ধ থাকে তখন কি করে চলে আপনাদের?'

শৈল বললেন, 'তখন ঠোঙা বানিয়ে বিক্রি করি। সুধা নানা রকমের তেলেভাজা বানিয়ে দেয়—সেগুলো ঝুড়ি বোঝাই করে মাথায় নিয়ে পাড়ায় পাড়ায় বিক্রি করি। তিনটে পেট তাতে কোনওরকমে চলে যায়।'

এঁদের এই অনিশ্চিত সংগ্রহের অন্নে ভাগ বসাতে একটু মন খুঁতখুঁত করছিল। কিন্তু এ-অমৃত গ্রহণ না করে এঁদের হৃদয় বিদীর্ণ করার কোনও অধিকার কি আমার আছে? ছিটেফোঁটা ঘি-এর ছোঁয়ায় গরম ফ্যানভাত, সঙ্গে কাঁচা লঙ্কা দিয়ে আলু ভাতে—জয় বাবা ঘোড়ানাথ। যুগিয়ে যেও, যুগিয়ে যেও।

আজ রেস নেই। অফিসে পৌঁছে কাজে মন দিলাম। এজেন্টের অফিস থেকে ফোন এলো। হিসেব-পত্র করে পঞ্চা টাকা নিয়ে আসছে। দাস সাহেবকে জিজ্ঞেস করলাম, 'গতকাল ছয় ও আট নম্বর রেসের স্কুপটা কোথায় পেলেন?'

দাস সাহেব বললেন, 'মিস্টার সিন্‌হা, ঘোড়ার মালিকে মালিকে বোঝাপড়ার ব্যাপার আছে। ছয় ও আট নম্বর রেসে স্বামীনাথন্‌-এর ঘোড়া জেতাটাও বোঝাপড়া। যে-ঘোড়া টপ ফেভারিট, সবাই নিশ্চিন্ত, জিতবেই—প্যাডকে শেষ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় পলকে—ফেভারিট ঘোড়ার মালিক জকিকে ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিল, শেষ মুহূর্তে সে যেন রাশ টেনে ধরে। এর ফলে কী হল—ফেভারিট ঘোড়ায় লাগানো টাকার পাহাড়টা বুকমেকারের হাতে এসে গেল। যে ঘোড়াটা জিতল, তার দর অনেক বেশি—কিন্তু তাতে টাকা লাগিয়েছে ক'জন? মাঝখান থেকে সেই ঘোড়ার মালিক উইনিং প্রাইজটা মেরে দিল—সাতাশি হাজার টাকা। ঘোড়ার মালিক, ট্রেনার, জকি ও বুকমেকারদের মধ্যে নানা ধরনের যোগসাজশ থাকে—যার নীট রেজাল্ট, পান্টার সর্বস্বান্ত হবে আর মালিক-বুকমেকারদের পকেট ভর্তি হবে। ট্রেনার এবং জকিরাও এর ভাগ পায়।'

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'কিন্তু আপনারা স্কুপটা পেলেন কোত্থেকে?'

দাস সাহেব বললেন, 'ওটাই তো আমাদের কাজ। কবে কোথায় গট-আপ হবে, আপসেট হবে—সেই খবরগুলো সংগ্রহ করাই আমাদের প্রধান কাজ। তবে অনেক সময় উল্টোপাল্টাও হয়ে যায়—ভুল খবর পেয়ে আমরাও অনেক সময় ফেঁসে যাই। এবারে একশো ভাগ নিশ্চিত ছিলাম বলেই আপনাকে টিপ্‌স্‌ দিয়েছিলাম। দেখলেন তো, কত আচ্ছা আচ্ছা পান্টারের জ্যাকপটের স্বপ্ন ছ নম্বর রেসেই শেষ হয়ে গেল।'

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'তা, আমার মতন আর কত জন জ্যাকপট জিতল?'

দাস সাহেব বললেন, 'খুব কম। টোটাল পুল যা হয়েছে, সেই টাকাটাকে আপনার প্রাপ্য টাকাটা দিয়ে ভাগ করলেই সংখ্যাটা পেয়ে যাবেন। আপনি পেয়েছেন প্রায় চার লাখ। আপনার সিলেকশনে লাভ কুড়ি হাজার। প্রথম তিনটে রেসে আপনি পেয়েছেন আট হাজার।'

কৃতজ্ঞচিত্তে আমি বললাম, 'ধন্যবাদ, দাস সাহেব। সময় পেলে যাব।'

'মোস্ট ওয়েলকাম। থ্যাঙ্ক য়ু।' ছেড়ে দিলেন দাস সাহেব।

কিছুক্ষণ পরে পঞ্চা এলো টাকার থলি নিয়ে। হিসেব-পত্র করাই ছিল। টাকাটা বুঝিয়ে দিল পঞ্চা। ওকে পাঁচ হাজার টাকা বখশিস দিলাম। ও

ছিয়াকে জড়িয়ে কাছে টেনে একটা চুমু খেতেই
পিয়া সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ল আমাদের দুজনের ওপর

খুশি হয়ে আমাকে সেলাম দিল। জিজ্ঞেস করল, 'দাস সাহেবের সঙ্গে কথা হয়েছে?'

আমি বললাম, 'হ্যাঁ, এই কিছুক্ষণ আগে।' বিদায় নিল পঞ্চা।

লাঞ্চের দেরি আছে। ভেতরে ভেতরে ঝিলিকের ফোনের অপেক্ষায় আছি। ইচ্ছে আছে, আজ ওর সঙ্গে লাঞ্চ করব। শরীর চাইলে সন্ধ্যার পর ইভিনার সঙ্গে কাটানো যাবে। ইভিনার ফোন পেলাম আগে। ওর মা অসুস্থ। ওকে বসিরহাট যেতে হচ্ছে। বলল, ফিরে এসে ফোন করবে। মাথায় ঝিলিকের ফুলকি ঝিকমিক করছে।

লাঞ্চের সময় পেরিয়ে যাচ্ছে। ঝিলিক ফোন করল না। ভুল করেছি, ওর নম্বরটা আমার নেওয়া উচিত ছিল। ইন্দ্রাণী পার্লস অ্যান্ড জুয়েলারি এম্পোরিয়ামে ফোন করে একটা ক্যাটালগ পাঠাতে বললাম। লাঞ্চটা বাধ্য হয়েই অফিসে সারতে হবে। অ্যান্টিচেম্বারে ঢুকে ভি-সি-পিতে একটা ভিডিও ক্যাসেট চালিয়ে একটু ভদকা নিয়ে বসে গেলাম। পৃথিবীবিখ্যাত কিছু রেসের এক্সক্লুসিভ কালেকশন ছবি হয়ে ফুটে উঠছে টিভি স্ক্রিনে। ভদকা খেতে খেতে রেসগুলো উপভোগ করছি।

হঠাৎ!—কী হল! ঝিলিককে দেখলাম মনে হল! মাথাটা গেছে আমার! এখানে ঝিলিক কোত্থেকে আসবে! গত বছরের বম্বে ডারবি দেখছি। গ্যালারিতে যেন উল্লসিত ঝিলিককে দেখতে পেলাম। মুহূর্তের জন্যে! কী আশ্চর্য! মাথায় এখন ঝিলিক ঢুকে বসে আছে।

রি-ওয়াইন্ড করে আর একবার দেখলাম স্লো মোশনে। ঠিক। ঝিলিকই তো মনে হচ্ছে! নাকি? ঝিলিকের মতোই অন্য কেউ? খুব মিল আছে কিন্তু। হিন্দি সিনেমার মাধুরী দীক্ষিতের সঙ্গে ঝিলিকের বেশ মিল আছে। হয়তো মাধুরীকেই ঝিলিক বলে ভুল করছি।

টিভি বন্ধ করে বেয়ারাকে লাঞ্চ দিতে বললাম। অফিসের লাঞ্চে অন্য কিছু দিতে না বললে বাঁধা মেনু। চিকেন ক্লিয়ার স্যুপ, দু টুকরো স্যাঁকা পাঁউরুটি দিয়ে চীজ স্যান্ডুইচ—পনেরো মিনিট পরে চিনি ছাড়া এক কাপ ব্ল্যাক কফি।

লাঞ্চ আসার আগে আর-একটু ভদকা নিলাম। অপারেটর ডাকছে ফোনে। ফোন তুললাম। ইন্দ্রাণী পার্লস থেকে লোক এসে গেছে। ক্যাটালগটা পাঠিয়ে দিতে বললাম।

ভদকা খেতে খেতে একটা সেট পছন্দ করলাম। বসরাই মুক্তো আর নীল হীরে বসানো কানের গলার আর নাকছাবির সেট। দাম লেখা নেই। কোড নম্বর লেখা আছে। ফোন করলাম ইন্দ্রাণীতে। দাম আশি হাজার। কিন্তু যার জন্যে কিনব তারই তো পাত্তা নেই। কোড নম্বরটা নোট করে ক্যাটালগটা ফেরৎ পাঠিয়ে দিলাম।

লাঞ্চ সেরে অফিস চেম্বারে ফিরে এলাম। ব্রাঞ্চ অফিস থেকে পাঠানো টেলেক্সগুলো দেখছি। একটু পরেই কফি এলো। দুটো এস-টি-ডি ফোন সারলাম। কফি খেতে খেতে দাদুর ছবিটায় চোখ পড়ল। বাবার বাবা। ছোটবেলায় বাবা-মাকে একসঙ্গে হারাই। প্রচুর ড্রিঙ্ক করে বাবা গাড়ি চালাচ্ছিল, পাশে মা। ট্রাকের সঙ্গে মুখোমুখি ধাক্কা। ঘটনাস্থলেই বাবা-মা মারা যায়। তখন আমার বয়স দশ। দাদুর পঞ্চান্ন। একমাত্র উত্তরাধিকার আমি বড় না-হওয়া পর্যন্ত দাদুকে বেঁচে থাকতে হয়েছিল শৃঙ্খলিত জীবন যাপনের মধ্যে। দাদু মারা গেছে পনেরো বছর হয়ে গেল। এই বিশাল ব্যবসার দায়-দায়িত্ব আমার কাঁধে চাপিয়ে চোখ বুজেছে দাদু। তখন রেসের মাঠ সম্পর্কে আমার কোনও ধারণাই ছিল না। একদিন একটা পুরনো আলমারি থেকে দাদুর লেখা একটা ডাইরি পেলাম। সেই ডাইরি পড়েই জানতে পারি—

ফোন বাজছে। তুললাম, 'হ্যালো—'

গির্জার ঘণ্টার মতো ধাতব নারীকণ্ঠ, 'মিস্টার সিন্‌হা?'

'কথা বলছি।'

'আমি বিদ্যুৎস্পৃষ্টা এক নারী—'

মুহূর্তে মাথার কোষগুলো শিথিল হয়ে গেল। অবচেতনে ঝিলিকের ফোনের অপেক্ষায় ছিলাম। মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, 'পূর্ণচন্দ্রা! জ্যোৎস্না মাখাও!'

কানে ধাতব হাসির ঝঙ্কার। তারপরেই, 'অসাধারণ! দারুণ রোম্যান্টিক!'

আমি আবার বললাম, 'জ্যোৎস্না মাখাও, সোনামণি!'

ঝিলিক বলল, 'কী ছেলেমানুষী হচ্ছে!'

আমি বললাম, 'এরকম প্রতীক্ষায় রাখো কেন? এই কি তোমার দুপুর?'

ও বলল, 'শোনো, আমি গুয়াহাটি এয়ারপোর্ট থেকে কথা বলছি। সকালে একটা জরুরি কাজে আসতে হয়েছিল। কলকাতা থেকে এয়ারবাসটা একটু আগে নামল। প্যাসেঞ্জার নিয়ে ছাড়তে ছাড়তে আধঘণ্টা। এখন পৌনে তিনটে। তার মানে কলকাতায় নামতে নামতে চারটে হবেই। তুমি যদি আমাকে পিক্-আপ করো তাহলে এয়ারপোর্টে গাড়ি পাঠাতে বারণ করব।'

আমি বললাম, 'চারটের মধ্যে আমি পৌঁছে যাব। তোমার অপেক্ষায় থাকব।'

ও বলল, 'ঠিক আছে। ছাড়ছি তাহলে।'

আমি বললাম, 'আচ্ছা।'

লাইন বিচ্ছিন্ন হল। দশ মিনিটের মধ্যে উঠে পড়লাম। নিচে নেমে কালু মিঞার কাছ থেকে গাড়ির চাবি নিয়ে ওকে ছুটি দিয়ে দিলাম। গাড়ি নিয়ে সোজা গেলাম ইন্দ্রাণী পার্লস-এ। নগদ আশি হাজার টাকা দিয়ে মুক্তো-হীরের সেটটা কিনলাম। ঘড়িতে এখন সাড়ে তিনটে। সোজা রওনা দিলাম এয়ারপোর্টের দিকে।

চারটে দশে ফ্লাইট নামল। ডোমেস্টিক অ্যারাইভ্যালে অপেক্ষা করছি। সার্ভিস ট্রান্সপোর্ট প্যাসেঞ্জারদের পৌঁছে দিচ্ছে অ্যারাইভ্যাল গেটে। আমার পাশ দিয়ে সব প্যাসেঞ্জাররা বেরিয়ে যাচ্ছে। এক সময় ফাঁকা হয়ে গেল। কোথায় ঝিলিক? ঝিলিক নেই!

মস্তিষ্ক ভার অথচ চিন্তাশূন্য। এই মুহূর্তে কী করব স্থির করতে পারছি না। কী করা উচিত, কোথায় যাওয়া দরকার ভেবে পাচ্ছি না। হঠাৎ ছুটে গেলাম ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্সের এক্সটেনশন কাউন্টারে। সেখানে গুয়াহাটি থেকে আগত প্যাসেঞ্জারদের তালিকা দেখতে চাইলাম। কাউন্টারের ভদ্রমহিলা প্যাসেঞ্জারের নাম জানতে চাইলেন। নাম? নাম তো ঝিলিক। কিন্তু ঝিলিক তো আমার দেওয়া নাম! আসল নাম? আসল নাম তো ফুল্‌কি। তাই তো বলেছিল ও। কিন্তু ফুল্‌কি কি ওর ভালো নাম? নাকি

ডাক-নাম? যাই হোক না কেন, পদবী কী? তাও তো জানি না। আমতা আমতা করে বললাম, 'ফুল্‌কি—'

ভদ্রমহিলা ঠোঁট টিপে হাসলেন। বললেন, 'সরি—ওই নামে কোনও প্যাসেঞ্জার নেই।'

হঠাৎ মনে হল, তিনটের আগে অফিস থেকে বেরিয়েছি। এমনও হতে পারে, কোনও কারণে ওর আসা বাতিল হয়েছে। সেক্ষেত্রে ও নিশ্চয়ই অফিসে ফোন করতে পারে। দ্রুত বাইরে বেরিয়ে এলাম। গাড়িতে বসে সেলুলারের বোতাম টিপলাম। রিসেপশনের মহিলাটির কাছে জানতে পারলাম, তিনটে পাঁচে গুয়াহাটি থেকে ফোন এসেছিল এক মহিলার। তিনি জানিয়েছেন, অনিবার্য কারণে তিনি জার্নি বাতিল করেছেন। যথাসময়ে তিনি যোগাযোগ করবেন।

হঠাৎ ঝিলিককে গুয়াহাটি যেতে হয়েছিল। সকালে গিয়ে বিকেলে ফিরে আসছিল। ফ্লাইট ছাড়ার আধ ঘণ্টা আগে ফোন করল এয়ারপোর্টে রিসিভ করার জন্য। কুড়ি মিনিট পরেই সিদ্ধান্ত বদল। জার্নি বাতিল। ভাবনার সূত্রগুলো ছিন্নভিন্ন হয়ে যাচ্ছে। কোনও বিপদে পড়ল নাকি? ওর কোনও হদিশ পাওয়াও আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

এখন আমি কী করব? ইভিনা থাকলে ওকে ফোন করা যেত। ওরও বিপদ, মা অসুস্থ। গেছে বসিরহাট। শৈল-সুধাদের বস্তিতে গেলেও ভালো লাগত। কিন্তু রাস্তা চিনে সেখানে পৌঁছতে পারব না। অতএব কোথাও গিয়ে মদে ডুব দিতে হবে।

ইস্টার্ন বাইপাশ ধরে ফিরে আসছি। বালিগঞ্জ কানেক্টর ধরে বিজন সেতু পেরিয়ে আমার গাড়ি ডানদিকে বাঁক নিচ্ছে। তার মানে আজ প্রাক্ সন্ধ্যায় আমি বালিগঞ্জ প্লেসে গৃহমুখী! জোড়া বউ আমাকে বাড়ির দিকে টানছে।

বালিগঞ্জ প্লেসের বাড়িটা দাদুর আমলের। দু বিঘা জমির চতুর্দিক পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। পাঁচিলের ওপর তিন ফুট উঁচু কাঁটাতারের বেড়া। প্রবেশ দ্বারে সেকালের বিশাল লোহার গেট। গেটের ভিতরে মোরাম ছড়ানো পথ—একটা গিয়েছে বাঁয়ে, গ্যারাজের দিকে—একটা সোজা বাসগৃহের

দিকে। বাসগৃহটি দ্বিতল, বাংলো টাইপ। কাঠের সিঁড়ি, কাঠের মেঝে—দোতলার ছাদটা পিরামিডের মতন। বাড়ির একতলায় বিশাল ড্রইং, তার লাগোয়া তিনটে ঘর। একটা কিচেন, একটা বাথরুম, একটা গেস্টরুম। বাঁদিক দিয়ে কাঠের সিঁড়ি গোল হয়ে ডানদিকে ওপরে উঠে গেছে। দোতলায় ড্রইং-ডাইনিং আলাদা করে কিছু নেই। ছড়ানো গোল চত্বর। সামনের দিকে খোলা ব্যালকনি। দামী কার্পেটে ঢাকা কাঠের মেঝে। নিচের মতোই তিনটে ঘর। দুপাশে দুটো বেডরুম। মাঝখানের ঘরটা আধাআধি পার্টিশন করা। দু ঘরের লাগোয়া দুটো বাথরুম। ড্রইং-কাম-ডাইনিং-এ দামী সোফাসেট, সেন্টার টেবিল। একপাশে ডাইনিং টেবিল, পাশে বিশাল ফ্রিজ। সোফার মুখোমুখি আটাশ ইঞ্চি স্ক্রিনের ইমপোর্টেড টিভি। সোফার বাঁদিকে মদের সেলার, বার-কাউন্টার।

বাড়িটা বড়জোর চারকাঠার ওপর। বাড়ির ডানদিকে আরও একটা গ্যারাজ ও আউটহাউস। বাকি খোলা জমিটা পুরোটাই বাগান। যেমন সিজন, তেমন ফুলের বাহার। কাজের লোকজন, মালি, ড্রাইভার—প্রত্যেকের জন্যে আউটহাউসে থাকবার আলাদা ব্যবস্থা। ওপরের দুটো বেডরুমে আমার দুই বউ থাকে। পালা করে একেক দিন একেক জনের কাছে থাকি। কখনও কখনও দুই বউ নিয়ে একঘরেও থেকে যাই। দুই বউ সহোদরা। এক বছরের পিঠোপিঠি। একজন যদি রবিনা ট্যান্ডন, অপরজন শিল্পা শেঠী। দুটোই রূপের খনি। চোখ ধাঁধানো রূপ, দেহের প্রতি খাঁজে খাঁজে যৌবনের হিল্লোল। দুই বউ দুই সখী। কেউ কাউকে হিংসে করে না। বিলাস বৈভবের প্রাচুর্যে দুজনেই কিছুটা অহঙ্কারী। কিন্তু দুজনেই পতির সেবিকা।

প্রবেশদ্বারে পৌঁছে হর্ন বাজাতেই দারোয়ান গেট খুলে সেলাম জানাল। ওপরের ব্যালকনি থেকে জোড়া সার্চলাইটের তীব্র ঝলকানি! আমার জোড়া বউ দুজনে দুজনকে পাল্লা দিয়ে নিজেদের সাজিয়েছে। গাড়ি গ্যারাজ করে ফিরে এসে দেখলাম, জোড়া বউ আমাকে স্বাগত জানাতে নিচে নেমে এসেছে। মৌটুস্‌কি আর ফুলটুস্‌কি। ডাক নাম হিয়া আর পিয়া। কুইনেলার সিওর শট। কে প্রথম, কে দ্বিতীয় বলা মুশকিল। এই কুইনেলা আমি

রেসের মাঠেই জিতেছিলাম। দুই বোনকে একসঙ্গে দেখেছিলাম—দুজনেই আমাকে একযোগে তীরবিদ্ধ করেছিল।

বারো বছর আগের কথা। রেসের মাঠে যাবার উৎস ও কারণ আমার দাদু। আজ দুপুরে দাদুর ডাইরি পর্যন্ত পৌঁছতেই ঝিলিকের ফোন পাই। ডাইরি থেকে হারিয়ে গিয়েছিলাম এতক্ষণ।

'কি ব্যাপার, দাঁড়িয়ে রইলে যে!' হিয়ার জিজ্ঞাসা।

'শরীর খারাপ নাকি?' এটা পিয়ার গলা।

নিমেষে একযুগ পেরিয়ে এলাম। বললাম, 'না-না, শরীর ঠিকই আছে। আসলে তোমাদের দেখে কী যে হয়! কেমন যেন তলিয়ে যাই। অতীত বর্তমান সব গুলিয়ে যায়।'

দুজনেই একসঙ্গে আমার দু-বাহু জড়িয়ে নিল। হিয়া বলল, 'আগে ওপরে চলো, পরে কথা।' পিয়া বলল, 'এখন কোন কথা নয়, আগে হাত-মুখ ধুয়ে ফ্রেশ হও, কিছু মুখে দাও, তারপর কথা।' হিয়া বলল, 'কোথা থেকে ফিরলে? মুখ-চোখ একটু শুকনো শুকনো লাগছে!' পিয়া বলল, 'বলছিলাম না, শরীর খারাপ কিনা!' দুজনের সঙ্গে ওপরে এলাম।

মৃদু গরম জলে হাত-মুখ ধুয়ে টিলে পাজামার ওপর ড্রেসিং গাউন চাপিয়ে বড় সোফাটায় বসলাম। দু-পাশে দুই বউ। হিয়াকে জিজ্ঞেস করলাম, 'কী নেবে তুমি—হুইস্কি? না, ডুয়েট জিন?'

হিয়া বলল, 'আমি ভদকা নেব লেমন স্লাইস দিয়ে।'

পিয়াকে বললাম, 'তুমি কী নেবে?'

ও বলল, 'তুমি যা নেবে।'

আমি বললাম, 'আমি তো স্কচ নেব।'

পিয়া বলল, 'আমিও তাই—স্কচ।'

হিয়া বলল, 'পিয়া, তুই রোজিকে বল্ ড্রিঙ্কস্ আইস জল গ্লাস সব রেডি করে দিতে। আমি নিচে গিয়ে রানীকে স্ন্যাক্স্ রেডি করতে বলি।'

দুজনেই তৎপর হয়ে উঠল আমাকে নিয়ে।

হিয়া ফিরে এসে গ্লাসে গ্লাসে পানীয় ঢেলে বরফ আর জল মিশিয়ে রেডি করে দিল। আমরা যে-যার গ্লাস তুলে নিয়ে উল্লাস প্রকাশ করলাম।

সারাদিনের ক্লান্তি, ইভিনার অনুপস্থিতি, ঝিলিকের জন্য হতাশা—মুহূর্তে উবে গেল সব। দুটো বউ নিয়ে পরম নিশ্চিন্তে সুখের সাগরে গা ভাসালাম। মাথায় কিন্তু তখনও ঘুরছে দাদুর ডাইরি।

হিয়া আমার বাঁদিকে, পিয়া ডাইনে। দুজনেই আমার গায়ের কাছে ঘন হয়ে বসেছে। এখন ওপরে আমরা তিনজন ছাড়া কেউ নেই। না ডাকলে কেউ আসবেও না। আমি বাঁহাতে হিয়াকে জড়িয়ে কাছে টেনে একটা চুমু খেলাম ঠোঁটে। সঙ্গে সঙ্গে পিয়া ঝাঁপিয়ে পড়ল আমাদের দুজনের ওপর। হিয়ার কবল থেকে আমাকে মুক্ত করে আমার ঠোঁট টেনে নিল নিজের মুখে। এই খুন্‌সুটিটা দেখব বলেই হিয়াকে চুম্বন করেছিলাম।

পিয়া শান্ত হতে দু-হাতে দুজনকে জড়িয়ে ধরলাম। দুজনে আমার দু-গালে চুমু খেল। আমি শিথিল হতে দুজনেই একটু আলগা দিল। আমি পিয়াকে জিজ্ঞেস করলাম, 'আচ্ছা পিয়া, দাদুর সেই ডাইরির কথা তোমার মনে আছে?'

পিয়া বলল, 'মনে থাকবে না কেন, তোমার দাদুর গুপ্তধন রহস্য বল!'

হিয়া বলল, 'গুপ্তধন না, বল্ অশ্ব-রহস্য। ঘোড়া-ভাগ্যও বলতে পারিস।'

আমি বললাম, 'ঘোড়া-ভাগ্যই বটে! গতকাল পাইকপাড়ার এক বস্তিতে গিয়েছিলাম। একজন মহিলা, তার বাবা এবং তার প্রাণের ঠাকুর—তিনজন দরিদ্র মানুষ ঘোড়া-ভাগ্যের ওপরই বেঁচে আছে আঠারো বছর। ঘোড়াই তাদের কাছে ভগবান।'

হিয়া বলল, 'তোমার ভগবানও তো ঘোড়া!'

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'একথা বলছ কেন? রেস খেলি বলে?'

পিয়া বলল, 'বোধ হয় না। ও সম্ভবত বলতে চাইছে, তোমার দাদুর ভাগ্যের উৎস তো ঘোড়া। সেই যে কোন্ ব্রিটিশ ঘোড়ার মালিক একজন নেটিভ মহিলার সঙ্গে—'

আমি দেখলাম, কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরিয়ে পড়বে। সেই ব্রিটিশ ঘোড়ার মালিকের ব্যাপারটা বিস্তারিত জানাজানি হলে দাদুর জন্মরহস্য ফাঁস হয়ে যাবে। সেক্ষেত্রে বংশানুক্রমে—এ সবই দাদুর স্বীকারোক্তি—ডাইরির পাতায় লেখা আছে। আমি ধামা চাপা দেবার জন্য হঠাৎ প্রসঙ্গ

পাল্টে বললাম, 'তার চেয়ে তোমাদের কাকার ভূমিকাটা কম ইন্টারেস্টিং নয়। তোমাদের পাবার উৎস তো তোমাদের কাকাই। তাই না?'

নিজেদের প্রসঙ্গ আসতে ওরা উৎসাহিত হল। প্রায় একযোগে দুজনেই সায় দিল। হিয়া বলল, 'যা দেমাক দেখিয়েছিলে!'

পিয়া বলল, 'আমি তো বেঁকেই বসেছিলাম।'

আমি বললাম, 'সোজা হলে কেন?'

পিয়া আমার বাহুতে একটা চিম্‌টি কেটে বলল, 'নিজের গুণকীর্তন শুনতে খুব ভালো লাগে, না?'

হিয়া বলল, 'বল্ না বাবা, প্রথম দর্শনেই প্রেমে পড়ে গিয়েছিলি। একেবারে চিৎপাত যাকে বলে!'

পিয়া বলল, 'নিজের কথাটা আমাকে দিয়ে বলাতে চাইছিস কেন? তুই নিজে মজিসনি?'

আমি বললাম, 'আসল নাটের গুরুর কথা বল না—ঘটক-প্রবর তোমাদের কাকা শ্রীযুক্ত সবিতাব্রত ভৌমিক!'

হিয়া বলল, 'ও-ভাবে বোলো না। ছোটবেলায় যখন বাবা-মাকে একসঙ্গে হারাই, তখন আমার বয়েস পাঁচ, পিয়ার চার। তখন থেকেই তো আমরা কাকার গলগ্রহ। কিন্তু কাকা কোনওদিন বাবা-মায়ের অভাব টের পেতে দেয়নি। আমাদের দুজনের কথা ভেবে বিয়েই করল না। কত-বড় স্যাকরিফাইস বল?'

পিয়া বলল, 'জানো, কাকার কাছে গল্প শুনেছি, বাবা দারুণ ডাকা-বুকো ছিল। আমাদের গ্রামে বাবার খুব পসার ও নামডাক ছিল। মা ছিল ডাকসাইটে সুন্দরী। ডাকাতদের হাত থেকে মাকে ঠেকাতে গিয়ে বাবা খুন হল। তিনজন ডাকাত নাকি মাকে নিয়ে পালিয়ে যায়। কয়েকদিন পরে ধানক্ষেতে মায়ের—'

পিয়া কেঁদে ফেলল। আমি ওর পিঠে সান্ত্বনার হাত রাখলাম।

হিয়া বলল, 'শুধু আমাদের কথা ভেবে, আমাদের মানুষ করার জন্যে কাকা সব বিষয়-সম্পত্তি বিক্রি করে দিয়ে আমাদের নিয়ে শহরে চলে এলো। সেই তখন থেকে আমরা বেলেঘাটাবাসী।'

পিয়া শান্ত হয়েছে। আমি বললাম, 'তোমাদের কাকা কতবার আমাকে বাড়িতে নিয়ে যেতে চেয়েছিল—আমি একদিনও রাজি হইনি।'

হিয়া বলল, 'কাকার দুঃখ তুমি বুঝবে কি করে! ধিঙ্গি দুটো ভাইঝিকে পার করার জন্যে কাকা তখন মরিয়া। পাত্র তো কম জোটেনি। কিন্তু কাকার নজরটা ছিল একটু উঁচু। কাকার নেশা ছিল তাসের জুয়ায়। বাড়িতে জুয়ার আসর বসত। আগন্তুকরা সবাই ছিল যুবক। বয়স্ক ব্যক্তিদের কাকা বিশেষ পাত্তা দিত না। কাকার আসল উদ্দেশ্য ছিল, পাত্র বাছাই। মেলামেশা করতে করতে কাকা হিসেব কষত, কাকে জামাই করা যায়। আমি চা-টা দেবার জন্য মাঝে মাঝে আসরে যেতাম। আসল উদ্দেশ্য ছিল নিজেকে দেখানো। আমাকে দেখে কারও অপছন্দ হত না। কিন্তু বিয়ে করে দায়িত্ব নেবার গরজ কারো ছিল না। সকলের চোখেই দেখেছি ভোগের লালসা। কাকার অনুপস্থিতিতে ছুতো করে কেউ কেউ আসত। সিনেমা, থিয়েটার, রেস্তোরাঁয় নিয়ে যেতে চাইত—আমি সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেছি। একবার একটি ছেলে আমাকে বিয়ে করবে বলে আগে-ভাগেই শুতে চেয়েছিল। তাকে চুলের মুঠি ধরে একটা থাপ্পড় মেরেছিলাম। তারপর থেকে সে আর ও-মুখো হয়নি। কাকাকে অনুযোগ করেছিলাম, উদ্বেগ আর দুশ্চিন্তার রেখা ফুটেছিল কাকার চোখে-মুখে।

'সপ্তাহে দিন দুয়েক কাকা রেসের মাঠে যেত। জীবনে কোনওদিন রেস খেলেনি। রেসের কিছু বুঝতও না কাকা। ওখানেও যেত পাত্র খুঁজতে। তিন-চারটে যুবককে বাড়িতে নিয়ে এসেছে। বড়লোক বাপের বখাটে লম্পট ছাড়া কিছু মনে হয়নি তাদের।

'এরপরই তোমার কথা শুনতাম কাকার মুখে। কাকা তোমার প্রশংসা করে বলত—এক জ্যোতির্ময় সুপুরুষ ছেলের সন্ধান পেয়েছি। ধনী, নিরহংকারী, ব্যক্তিত্বপূর্ণ। তিন কুলে কেউ নেই। কিন্তু ছেলেটাকে বাড়িতে আসবার কথা বললেই কোনো-না-কোনো কাজের অজুহাতে এড়িয়ে যায়। শেষে একদিন তোমার সঙ্গে কাকা এ-বাড়িতে এসেছিল—'

'হ্যাঁ, সেদিন রেসের মাঠে আমি ভরাডুবি হয়েছিলাম,' আমি বলতে শুরু করি, 'উল্টোপাল্টা বাজি লাগিয়ে মোটা টাকা হেরে গিয়েছি। তোমার কাকা সম্ভবত কাছে-পিঠে থেকে আমাকে লক্ষ্য রেখেছিলেন। আমি যখন

বেরুবার প্রস্তুতি নিচ্ছি, সেই সময় উনি আমার সামনে এসে কাঁধে একটা হাত রাখলেন। বললেন, কি ব্যাপার মিস্টার সিন্‌হা, আজ আপনাকে বড় বিষণ্ন দেখাচ্ছে যে, রেজাল্ট আপ-সেট নাকি? আমি বললাম, রেসের মাঠের ফলাফলে আমি বিব্রত বোধ করি না। উত্তেজনাটাই আমার কাছে আসল। আপনার কেমন হল আজকে? কাকা আমতা আমতা করে বললেন, আমি—মানে—আজ আমি খেলিইনি। আমি বললাম, সে কি! তিন নম্বর রেসে দুই আর পাঁচ নম্বরে কুইনেলা তো শিওর ছিল। তাছাড়া পাঁচ নম্বর রেসেও— আমাকে অবাক করে দিয়ে উনি বললেন, আসলে আমি কোনওদিন রেস খেলিনি। আমি অবিশ্বাস্যভাবে ওঁকে জিজ্ঞেস করলাম, সেকি! আপনি তো মশাই প্রায়ই আসেন। কী জন্যে আসেন তাহলে? উনি বললেন, এখানে একজনকে খুঁজতে আসি। তাকে দেখেওছি এখানে। কিন্তু সে আমাকে চিনতে পারেনি। হঠাৎ মনে হল ওঁর চোখ ছলছল করছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, কোথায় যাবেন এখন? উনি বললেন, কিছু ঠিক করিনি। আসলে যেখানেই যাই না কেন—সব সময় আমার চোখ তাকে খুঁজে বেড়ায়। এ এক নিরন্তর যাতনা, অশেষ অনুসন্ধান। ওঁর কথা শুনে মনটা বিগড়ে যাচ্ছিল। জিজ্ঞেস করলাম, মদ্যপান করেন? বললেন, করি। নিয়মিত নয়। আমি বললাম, চলুন, আজ আমার সঙ্গে বসবেন। উনি বললেন, তাহলে আমার বাড়িতে চলুন। আমি বললাম, সে হবে একদিন। আজ আমার বাড়িতে চলুন। আমি আজ আপনাকে খাওয়াব। সেদিন এই বাড়িতে ওঁকে নিয়ে এসেছিলাম। রাতের ডিনার খাইয়ে কালুকে দিয়ে বাড়ি পাঠিয়েছিলাম।'

পিয়া অনেকক্ষণ কথা বলেনি। দরদী মায়ায় ওকে দেখলাম। ও হাঁ করে আমার মুখের দিকে তাকিয়েছিল। আমি ওর গালে একটা আঙুল বুলিয়ে দিলাম। ও বলল, 'সেদিন অনেক রাত অবধি কাকা তোমার কথা বলেছিল। পরের দিন আমরা মাঠে গিয়েছিলাম। প্রথমে ঠিক হয়েছিল, হিয়া যাবে কাকার সঙ্গে। পরে ও বলল, আমাকেও যেতে হবে। আমি না গেলে হিয়ার সঙ্গেই তোমার বিয়ে হত।'

আমি বললাম, 'পরে তোমার সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক হতে পারত।'

পিয়া বলল, 'হিয়া সেটা মেনে নিতে পারত না। কেননা, তখন তোমার ওপর ওর অধিকার জন্মে যেত।'

হিয়া বলল, 'আমার বদলে প্রথম পিয়াকে দেখলে কি হত?'

আমি বললাম, 'একই ব্যাপার হত। তখন বিয়ে হত পিয়ার সঙ্গে। পরে তোমাকে দেখে অনুরক্ত হতাম।'

পিয়া বলল, 'তোমাকে দেখার পর নিজেকে অপরাধী মনে হয়েছিল। মনে হয়েছিল, কোনও দুর্বল অসতর্ক মুহূর্তে আমি হিয়ার কাছ থেকে তোমাকে ছিনিয়ে নিতে পারি। কেননা, তখন ধরেই নিয়েছিলাম, হিয়ার সঙ্গেই তোমার বিয়ে হবে।'

হিয়া বলল, 'পিয়াকে দেখেই আমি বুঝতে পেরেছিলাম, ও তোমার প্রেমে পড়েছে। এদিকে আমিও প্রচণ্ড দুর্বল বোধ করছিলাম তোমার জন্যে। বুঝতে পেরেছিলাম, পিয়াকে তোমার হাতে তুলে দিলেও নিস্তার পাব না। যে কোনও সময় নিজেকে তোমার কাছে সঁপে দিতে পারি। দুই বোন পরস্পরের মনের কথা পড়তে পেরেছিলাম। তখনও তোমার প্রতি কারো নিজস্ব অধিকার জন্মায়নি। কিন্তু দুজনেই তোমাকে স্বামী হিসেবে বা প্রেমিক হিসেবে ভাবতে শুরু করে দিয়েছি। তখন পিয়াকে ডেকে বললাম, তুই বিয়ে কর। পিয়া বলল, না-না, তুই বিয়ে কর। আমি বললাম, তোর বরকে আমি কেন বিয়ে করব? ও বলল, তোর বরকেই বা আমি বিয়ে করব কেন? দুজনেই দুজনের কাছে ধরা পড়ে গেলাম। তখন আমি বললাম, তুই বিয়ে কর, মাঝে মাঝে আমার কাছে ছেড়ে দিস। ও বলল, তা হয় না। তখন দুজনে দুজনকে ঈর্ষা করব। কারণ, তখন আমার অধিকার জন্মে যাবে। তার চেয়ে এক কাজ কর। প্রথম থেকেই দুজনে অধিকার ভাগ করে নিই। আমার মনের কথাটাই ওর মুখ দিয়ে বেরুল। কাকাকে জানালাম আমাদের বোঝাপড়ার কথা। কাকা খুবই দুর্ভাবনায় পড়ল। কথাটা তোমাকে বলে কী করে! তখন আমরাই দায়িত্ব নিলাম তোমাকে সব খুলে বলার। তখন যদি দুজনের প্রতিই তোমার দুর্বলতার কথা স্বীকার না করতে তাহলে বিপদ হত।'

আমি বললাম, 'ঢালো, অনেকক্ষণ তো শেষ হয়ে গেছে।'

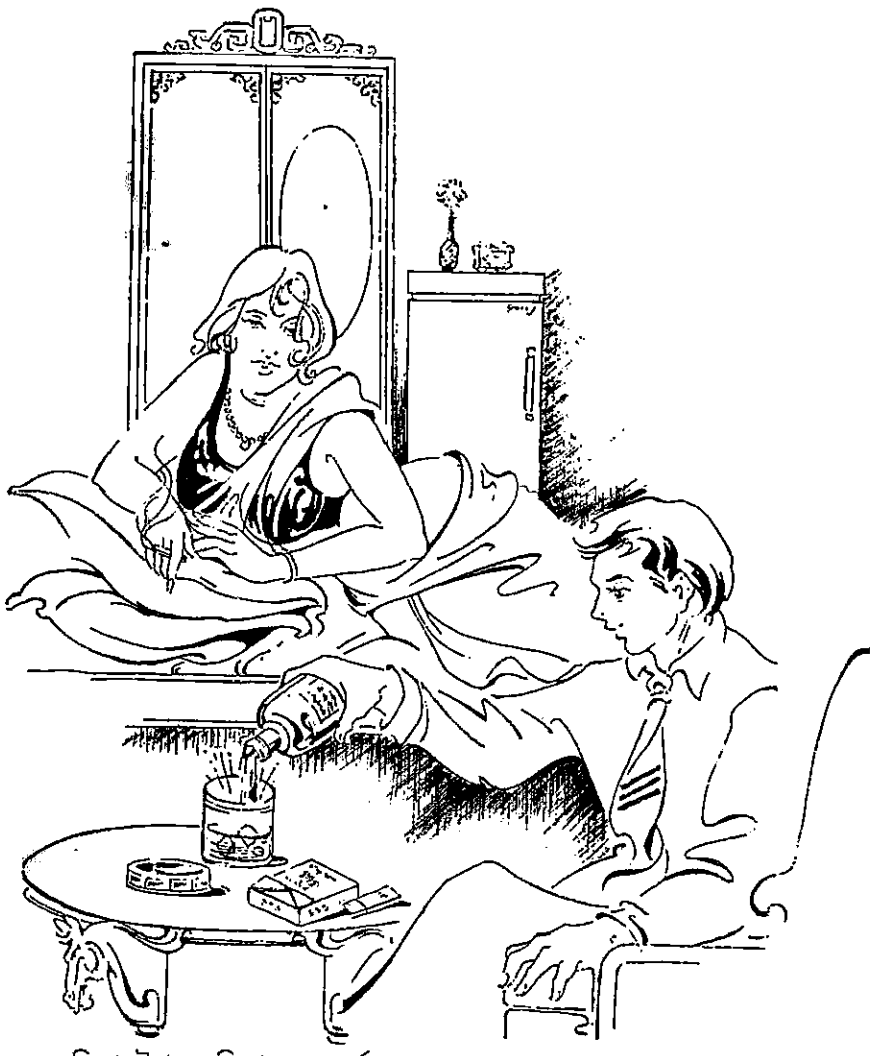

বিষণ্ণ উদাস নন্দিতার মন বর্তমান থেকে

ডানা মেলে উড়ে যাচ্ছে অতীতে—পিছনে, অনেক পিছনে...

পিয়া বলল, 'আমার শীত করছে, চলো ঘরে গিয়ে বসি।'

হিয়া বলল, 'তোরা ঘরে যা, আমি দেখি রানী কী খাবার বানাল। রোজিকে দিয়ে পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

পিয়াকে নিয়ে হিয়ার ঘরে গেলাম। ঘরে ঢুকেই ওকে জড়িয়ে ধরে চুম্বন করতে গেলাম। ও বাধা দিল। বলল, 'হিয়াকে লুকিয়ে কিছু কোরো না। আজ থেকে আমরা তিনজন একসঙ্গে থাকব। আমরা দু-বোন একসঙ্গে মা হতে চাই।'

আজ মঙ্গলবার। মাঠ-শূন্য দিন। আজও কোনও রেস নেই। অফিসে আসার পথে সার্কাস অ্যাভিন্যুতে কাদের আখতারের ফ্ল্যাটে হাজির হলাম। বেল বাজাতে আখতারের বিবি মুমতাজ দরজা খুলে আমাকে দেখে একটু অবাক হল। সেটা অবশ্য মুহূর্তের জন্য। তারপরেই সরে গিয়ে আমাকে ঢোকার পথ করে দিল। আমি ভিতরে ঢুকতেই ও দরজা বন্ধ করে আমার মুখোমুখি হল। আমাকে সোফা দেখিয়ে বসতে বলে 'আসছি' বলে ভেতরে চলে গেল। সোফায় বসে আমি একটা সিগারেট ধরালাম। কোথাও কোনও শব্দ নেই। মনে হচ্ছে বাড়িতে আর কেউ নেই। আমি অস্বস্তি বোধ করলাম। মিনিট তিনেক পরে মুমতাজ পোশাক বদলে, শ্রীহীন চেহারাটাকে একটু লেপে বেরিয়ে এলো। আমার সামনের সোফায় বসে কী বলবে ভাবছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'বাড়িতে কেউ নেই?'

ও জবাব দিল, 'না। ছেলেদুটোকে আমার বোন নিয়ে গেছে।'

আমি বললাম, 'কাগজে খবরটা পড়ে খুব কষ্ট পেয়েছি। শনিবার ওর ঘোড়ায় বাজি লাগিয়েছিলাম। উইন না-পেলেও এই দুর্ঘটনার কথা ভাবতে পারিনি।'

মুমতাজ বলল, 'দুদিন পুলিশ এসে খোঁজ-খবর নিয়ে গেছে। অবশ্য জানি, কিছুই হবে না। এটা পুরোপুরি মাফিয়া চক্রের ব্যাপার। বিশাল পুল হয়েছিল। দর নেমে গিয়েছিল দুই থেকে একে। পরের রেসগুলো বাতিল না হলে জ্যাকপট ক্যারেড ওভার হয়ে যেত। চার নম্বর রেসে অন্য কোনও ঘোড়ায় কেউ-ই উইনের বাজি ধরেনি। ফলে, শুরুতেই জ্যাকপট আপসেট। সাধারণত এই ধরনের আপসেট করাতে হলে জকিকে

ঠারে ঠোরে জানান দেওয়া হয়। কিন্তু এক্ষেত্রে ওকে কিছু না জানিয়ে স্যাড্‌ল-এ পিনের ফুটোটা সামান্য চিরে দেওয়া হয়েছিল। কাজেই ওকে খুন না করে উপায় ছিল না। বাড়িতে ফিরে এসব কথা ও আমাকে বলেছিল। তখনও জানি না, সেদিনই ও খুন হবে। রাত আটটা নাগাদ একটা ফোন এলো। ও বলল, জরুরি দরকারে একটু বেরুচ্ছি। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই ফিরব। সেই যে গেল—'

গলা ধরে গেল মুমতাজের।

আমি বললাম, 'সব খবর জানি না। তবে আন্দাজ করছি অনেক কিছু। আপনি তো জানেন, ও আমার পরম বন্ধু ছিল। যদি আপনাদের কোনও সাহায্যে লাগতে পারি, আমার ভালো লাগবে।'

মুমতাজ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলল, 'হ্যাঁ, ও-ও আপনাকে খুবই ভালোবাসতো। এখন তো একটা অনিশ্চিত অবস্থার মধ্যে পড়েছি। যারা ওকে মারল তারা একবারও আমাদের ভবিষ্যতের কথা ভাবল না। অবশ্য একেবারেই ভাবছে না, জোর দিয়ে বলা যায় না। হয়তো চোরা পথে একটা মোটা টাকা চলে আসতে পারে। সে যা-ই হোক-না-কেন, দরকার হলে আপনাকে অবশ্যই যোগাযোগ করব।'

আমি বললাম, 'দরকার হোক, না-হোক—আপনি আমাকে জানাবেন। আজ উঠি।'

অফিসের একটা কার্ড ওর হাতে দিয়ে উঠে পড়লাম।

অফিসে এসে শুনলাম বম্বে থেকে বুলু দাস ফোন করেছিল। মেসেজ রেখেছে, সামনের সোমবার কলকাতায় আসছে। বুলুকে বহুদিন ধরে চিনি। গ্রেট গ্যাম্বলার। বলিউডের ফিল্মি দুনিয়ায় ওর আস্তানা। বিস্তর যোগাযোগ। একডাকে সবাই ওকে চেনে। কলকাতায় আসছে যখন, কোনো মতলব নিয়েই আসছে। এলেই জানা যাবে সব। আরেক জনের ফোন এসেছিল। নাম—নন্দিতা মালিয়া। পরে ফোন করবে বলেছে। বুঝতে পারলাম না, কে!

অফিসের কাজে মন দিলাম। দ্রুত কেটে গেল ঘণ্টা দুয়েক। হঠাৎ কী মনে হল, রিসেপশনের মহিলাটিকে বললাম, গতকাল বিকেলের এয়ারবাসে নন্দিতা মালিয়া নামে কোনও মহিলা গুয়াহাটি থেকে কলকাতায়

এসেছে কিনা খোঁজ নিতে। লাঞ্চের সময় ঘনিয়ে আসছে। জানি না, আজকেও অফিসে লাঞ্চ সারতে হবে কিনা। কাল ক্যালকাটা রেস। দাস সাহেবকে একবার যোগাযোগ করতে হবে।

দশ মিনিট পরে রিসেপশনের মহিলাটি জানাল, গতকাল বিকেলে গুয়াহাটি থেকে মিস এন. মালিয়া নামে একজনের কলকাতায় আসার কথা ছিল। শেষ মুহূর্তে তাঁর জার্নি বাতিল হয়। আজ সকালের ফ্লাইটে মিস মালিয়া কলকাতায় ফিরেছেন।

বুঝতে বাকি রইলো না—ফুল্‌কি, ওরফে ঝিলিক, ওরফে নন্দিতা মালিয়া একই মহিলা। ওর আসল নামটাই আজ ফোনে জানিয়েছে। এখনও পর্যন্ত ওর দ্বিতীয় ফোন আসেনি।

বহরমপুর থেকে একটা জরুরি ফ্যাক্স এলো। উত্তরবঙ্গ গমনরত একটা লরি আজ সকালে ব্রিজের রেলিং ভেঙে গঙ্গায় পড়ে গিয়েছে। খবর এসেছে লরিটা আমাদের। ড্রাইভারসহ তিন জন খালাসির কোনও পাত্তা নেই। সর্বনাশ! সঙ্গে সঙ্গে ডিস্ট্রিক্ট পুলিশ সুপারকে টেলিফোনে ধরতে বললাম। লাঞ্চ ডকে উঠল। আধ ঘণ্টা পরে সুপারকে ফোনে পেলাম। পরিচয় দিতে চিনতে পারলেন ভদ্রলোক। কলকাতায় আলাপ হয়েছিল একবার। তখন তিনি 'ভবানী ভবন'-এ ছিলেন। দশ মিনিট কথা হল ওঁর সঙ্গে। এক ঘণ্টা পরে আবার ফোন করতে বললেন উনি।

তিনটে বাজে। পেট ফাঁকা। অথচ কিছু খেতে ইচ্ছে করছে না। চারটে বিস্কুটসহ এক কাপ ওভালটিন দিতে বললাম। ঝিলিকের ফোন এলো। নন্দিতা মালিয়া। ওর ফোন নম্বর নিয়ে লরি বিপর্যয়ের কথাটা জানিয়ে দিলাম। ফ্রি হয়ে ওকে ফোন করব, বলে দিলাম।

যথাসময়ে সুপারের সঙ্গে কথা হল বহরমপুরে। লরিটা মাঝ গঙ্গায় পড়েছে। কোনও মৃতদেহের হদিশ এখনও পাওয়া যায়নি। ডুবুরি নামানোর ব্যবস্থা হয়েছে। নদীতে নজরদারি লঞ্চ নেমেছে। ভদ্রলোক আমাকে অনেকটা আশ্বস্ত করলেন। নিজেই দায়িত্ব নিলেন অনেকটা। রাতে ফোন করতে বললেন। কৃতজ্ঞতা জানিয়ে লাইন ছেড়ে দিলাম।

সাড়ে চারটে বাজে। খুব ক্লান্ত বোধ করছি। অস্থিরতা কিছুটা কেটেছে। ফোন করলাম নন্দিতাকে। নিভৃতে পেতে চাইলাম ওকে। কোনও পাবলিক

প্লেসে যেতে ইচ্ছে করছে না। ও একটা অ্যাপার্টমেন্টের ঠিকানা আর ফোন নম্বর দিল। লোকেশন ম্যান্ডেভিল গার্ডেন্স। আমার বাড়ির খুব কাছে। সময় দিল সাড়ে পাঁচটা।

গতকাল ইন্দ্রাণী পার্লস থেকে কেনা গিফ্‌ট্ প্যাকেটটা গাড়ির লকারে রাখা ছিল। আজ সকালে কালু গাড়ি বের করেছে। ওকে একবার ডেকে পাঠালাম।

ও এলে বললাম, লকার থেকে প্যাকেটটা বের করে আনতে। প্যাকেটটা ওর কাছ থেকে নিয়ে ছুটি দিয়ে দিলাম। ডুপ্লিকেট চাবি আমার সঙ্গে থাকে। ও সেলাম জানিয়ে চলে গেল।

দাস সাহেবকে একটা ফোন করলাম। কালকের কলকাতা রেস নিয়ে কিছু আলোচনা হল। কাল দেড়টায় রেস শুরু। বারোটার আগে ফোন করতে বললেন উনি।

অ্যান্টিচেম্বার থেকে একটা গ্লেন্‌লিভেট হুইস্কি বের করলাম। বেয়ারাকে ডেকে হুইস্কি আর গিফ্‌ট প্যাকেটটা দিয়ে নিচে নামতে বললাম। ঝিলিকের দেওয়া ফোন নম্বরে একটা ফোন করলাম। নো রিপ্লাই। পাঁচটা বাজে। উঠে পড়লাম।

অফিস থেকে বেরিয়ে সরাসরি দক্ষিণে যাওয়া যায় না। যানবাহনের গতি এখন উত্তরমুখো। একটা গলি ধরে ফ্রি স্কুল স্ট্রীটে পড়লাম। পার্ক স্ট্রীট, ক্যামাক স্ট্রীট হয়ে ডানদিকে থিয়েটার রোড। অ্যাস্টর হোটেলে গাড়ি ঢুকিয়ে দিলাম। দু প্লেট চিকেন রেশমী কাবাব মাইক্রো ওভেনে গরম করিয়ে ফয়েল প্যাক করিয়ে নিলাম। ঘড়িতে পাঁচটা পঁচিশ। ওখান থেকে আর একবার ফোনে চেষ্টা করলাম ঝিলিককে। পেয়ে গেলাম ওকে। জাস্ট ঢুকেছে। ওকে বলে দিলাম, হুইস্কি আর কাবাব নিয়ে আসছি। মিনিট পনেরোর মধ্যে পৌঁছে যাব।

অফিস ছুটির জ্যাম কাটিয়ে ঝিলিকের কাছে পৌঁছলাম ঠিক ছটায়। ওর হাসি এবং আপ্যায়ন আবার মাধুরী দীক্ষিতকে মনে করিয়ে দিল। আমি ওর দিকে অপলক তাকিয়ে রইলাম। ও বলল, 'আমার দিকে ওভাবে চেয়ে থেকো না। আমার ভেতরটা কেমন করতে থাকে।'

আমি নিচু হয়ে সোফা-সেটের ওপর বোতল আর কাবাবের প্যাকেটটা রাখলাম। গিফ্‌ট প্যাকেটটা ওর দিকে বাড়িয়ে ধরলাম। ও জিজ্ঞেস করল, 'কি আছে?'

আমি বললাম, 'খুলে দেখ।'

ও প্যাকেটটা নিয়ে মোড়কটা খুলল। ঝকঝকে বাক্সটা ওর হাতে। আমার দিকে তাকাল একবার। তারপর বাক্সটা খুলল। একটা দ্যুতি ছিটকে বেরুচ্ছে বাক্স থেকে। চকিতে ও তাকাল আমার দিকে। বলল, 'একি! এত দামী সেট—!'

আমি বললাম, 'আমার কাছে তোমার চেয়ে দামী কিছু নেই!'

ও আমার খুব কাছে এগিয়ে এলো। মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'সব টাকাটাই আমার জন্যে খরচ করে দিলে?'

আমি বললাম, 'না। এবার তোমার জন্যে নিজেকে ভাঙাতে চাই।'

ও আমার আরও কাছে সরে এলো। ওর শরীরের স্পর্শ পেলাম। বলল, 'কী আছে আমার মধ্যে?'

আমি দু-হাতে ওর মাথাটা টেনে এনে মুখ নামালাম। বললাম, 'অপার রহস্য! দুর্বার আকর্ষণ।'

ওর ঠোঁটের স্পর্শ আমার ঠোঁটে। ও বলল, 'ওটা তো আমার কথা—'

দুজনেরই ঠোঁট ব্যস্ত, কথা বন্ধ হয়ে গেল।

বোধ হয় দু মিনিটের বেশি আশ্লেষে সংযুক্ত রইলাম আমরা। তারপর ধীরে ধীরে মুক্ত হলাম।

ও অস্ফুটে বলল, 'চলো, ঘরে গিয়ে বসি।'

আমি সোফা থেকে বোতল আর কাবাবের প্যাকেট তুলে নিয়ে ওকে অনুসরণ করলাম।

মাঝারি সাইজের বেডরুম। ডবল-বেড খাট। বড় আয়না লাগানো কাঠের আলমারি। একপাশে ডিভান, নিচু সেন্টার টেবিল। ঘর সংলগ্ন বাথরুম। এক কামরার কমপ্যাক্ট অ্যাপার্টমেন্ট। লিভিং স্পেসটা বড়। ওখানে সোফা-সেট, সেন্টার টেবিল, টিভি, ফ্রিজ। হাত ধোবার বেসিন। কিচেন সংলগ্ন আর-একটা বাথরুম।

আমি ডিভানে বসলাম। ও হুইস্কির বোতল আর কাবাব নিয়ে ব্যস্ত হল। সেন্টার টেবিলে সব গুছিয়ে রাখল। নিজে হাতে হুইস্কি ঢালল গ্লাসে। ফ্রিজের বরফ আর জল মিশিয়ে বসল আমার পাশে।

হুইস্কিতে চুমুক দিয়ে কাবাবের টুকরো তুলে নিলাম। খেতে গিয়েও কি মনে হল, টুকরোটা ওর মুখের কাছে ধরলাম। আধখানা কাবাবে ও কামড় বসাতেই বাকি আধখানা নিজের মুখে পুরে দিলাম। ও কিছুটা বিস্মিত হয়ে বলল, 'এ কি! তুমি আমার এঁটোটা খেলে!'

আমি বললাম, 'চুমু খেলে দোষ নেই, এঁটো খেলেই দোষ? শোনো — মদ, মেয়েমানুষ, বরফ, সাবান, চুমু কখনও এঁটো হয় না। মেয়েমানুষ না বলে যোনিও বলতে পারো।'

ও শরীর দুলিয়ে হাসলো। বলল, 'তুমি পারোও বটে।'

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'এটা কার অ্যাপার্টমেন্ট?'

ও বলল, 'আমার!'

জিজ্ঞেস করলাম, 'কে থাকে এখানে? তুমি থাকো বলে তো মনে হচ্ছে না।'

ও বলল, 'নিউ আলিপুরে বাবার বড় বাড়ি আছে। ওখানেই বেশি থাকি। এখানে আগে মা থাকত। মা এখন নিউ আলিপুরে থাকে। ফ্ল্যাটটা এখন আমার। ইচ্ছে হলে থাকি। নাহলে বন্ধ থাকে।'

জিজ্ঞেস করলাম, 'বাবা কোথায় থাকেন?'

ও বলল, 'বাবা বেশি থাকে মুম্বাই ব্যাঙ্গালোরে। কলকাতায় এলে নিউ আলিপুরে থাকে।'

আমি হিসেব করার চেষ্টা করছি। জিজ্ঞেস করলাম, 'কি করেন তোমার বাবা?'

ও গ্লাসে চুমুক দিল। বলল, 'বাবা ফিল্মমেকার। নাম শুনেছ—সুজয় মালিয়া।'

মুহূর্তে হিসেব ছারখার! কার নাম শুনছি! সুজয় মালিয়া তো কোটি কোটিপতি! তার মেয়ের সামনে বসে আছি! সুজয় মালিয়ার বোধহয় দুশো রেসের ঘোড়া আছে। কুড়ি-বাইশটা জকি। তিনি তো রেস দুনিয়ার

সর্বাধিক আলোচ্য প্রবাদ বিস্ময়! নিশ্চিত হলাম, বম্বে ডারবির ভিডিও ক্যাসেটে নন্দিতাকেই দেখেছিলাম।

আকস্মিকতায় আমি বোবা হয়ে গেলাম।

ও আমার গায়ে ঠেলা দিয়ে বলল, 'কী হল? কথা বলছ না কেন?'

আমি চিবুকে হাত ঘষতে ঘষতে বললাম, 'আমি কিছুই ভাবতে পারছি না। নন্দিতা মালিয়া—!'

ও বলল, 'ভাবার কী আছে। ওটা তো আমার আসল পরিচয় নয়। আমার আসল পরিচয় হল, আমি বিদ্যুৎস্পৃষ্টা এক নারী, আমার আসল নাম তো ঝিলিক! বিদ্যুতের ঝলকানি!'

আমার অস্বস্তি কাটতে চাইছে না। সুজয় মালিয়ার মেয়ে নন্দিতা মালিয়ার সঙ্গে চার দেওয়ালের মধ্যে পাশাপাশি বসে মদ খাচ্ছি, তাকে আশ্লেষে চুমু খেয়েছি! স্বপ্নাচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছি যেন। লজ্জা আমাকে গ্রাস করছে একটা কথা ভেবে—আমি তো ওকে সত্যিই একটা বাজারি মেয়েমানুষ ভেবে কিছু টাকা ধরিয়ে দিয়েছিলাম হাতে। ছিঃ ছিঃ! স্বর্গবাসীকে বিবরে নিক্ষেপ করতে চেয়েছিলাম আমি!

ওর গলা শুনতে পেলাম, 'এভাবে চিত্রার্পিতের মতন বসে থাকতে ভালো লাগছে না। তুমি না আমার বিদ্যুৎ! আমার প্রাণ-পুরুষ!'

আমি বিমুগ্ধ চোখে ওকে দেখলাম। অহঙ্কার-মুক্ত নিষ্পাপ সরল দেবীর মতন দেখাচ্ছে ওকে। বললাম, 'আমি তোমাকে চিনতে ভুল করেছিলাম। আমাকে ক্ষমা কোরো তুমি।'

ও আমার কাছে সরে এসে গলা জড়িয়ে ধরল। আবদার করে বলল, 'তোমাকে যেভাবে দেখেছি, যেভাবে গ্রহণ করেছি—এরপর ভুল বোঝাবুঝি, ক্ষমা—সবই অবান্তর। তুমি আমাকে ভালোবেসো, তাহলেই আমি শান্তি পাবো, সেখানেই আমার পূর্ণতা। আমার জীবনে অনেক কালো মেঘের সমাবেশ ঘটেছে। তার তো কিছুই তুমি জানো না। তোমায় যে সমস্ত কথা বলতে চাই। তুমি শুনবে না? দুখের ভারে আমি কতটা নুয়ে পড়েছি, তা জানতে পারলে তুমি সুজয় মালিয়ার মেয়েকে ভুলে যাবে—সেখানে তুমি আসল নন্দিতাকে আবিষ্কার করতে পারবে। আমার বিলাস-বৈভবের আড়ালে অনেক গ্লানি, অনেক অপমান, অনেক বেদনা চাপা পড়ে আছে।'

ওর কথা শুনতে শুনতেই আমি যেন ওর মধ্যে অন্য এক নারীর আবির্ভাব উপলব্ধি করলাম। অন্য এক নারী জেগে উঠছে ওর মধ্যে। আমি ওকে আঁকড়ে ধরে ভরসা দিতে চাইলাম। বোঝাতে চাইলাম, আমি তোমার অবলম্বন, তোমার সমব্যথী হিসেবে পাশে আছি।

ওর বিষণ্ণ মুখ ধীরে ধীরে উদাস হয়ে গেল। বর্তমান থেকে ডানা মেলে ওর মন উড়ে যাচ্ছে অতীতে—পিছনে, অনেক পিছনে—সেখান থেকে ভেসে আসছে ওর কণ্ঠস্বর, 'জানো, আমার মা কিন্তু সুজয় মালিয়ার স্ত্রী নয়। মাকে বাবা স্ত্রীর মর্যাদা ও স্বীকৃতি দেয়নি। আমাকে মেয়ে বলে মেনে নিয়েছে কিন্তু আমার অন্যান্য ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন এমনকি রেসিং ওয়ার্ল্ডের সবাই জানে, আমি সুজয় মালিয়ার রক্ষিতার মেয়ে।

'ব্যাঙ্গালোরে কয়েকশো একর জমির ওপর বাবার স্টাড ফার্ম বা ঘোড়ার আস্তানা আছে। রেসের ঘোড়ারা সেখানে রাজকীয় মর্যাদায় থাকে। তাদের তদারকি করার জন্য কয়েকশো নারী-পুরুষ দিবারাত্র ব্যস্ত। তাদের ঠিক সময়ে খাওয়ানো, ঠিক সময়ে ম্যাসাজ, ঠিক সময়ে এক্সারসাইজ করানো, গ্যালপ করানো, যোগ্য চিকিৎসা, ওষুধ-পত্র, পথ্য সরবরাহ করা—এই সব ব্যাপারে দেখভাল করার জন্য সেই নারী-পুরুষরা নিয়োজিত। ঘোড়াদের প্রশিক্ষণের জন্যে যোগ্য ট্রেনার নিয়োগ করা হয়। কয়েকজন ট্রেনার ঘোড়াদের নিয়ে নানা ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে যাচ্ছে নিরন্তর। সেই আস্তানা-সংলগ্ন জকিদের বসবাস। বাবার নিজস্ব বাইশটি জকি আছে। সপরিবারে তাদের বসবাসের জন্য বিশাল হাউসিং কমপ্লেক্স তৈরি করে দিয়েছে বাবা। কর্তব্যরত সমস্ত নারী-পুরুষ, ট্রেনার, জকি—এদের যাবতীয় খরচের সমস্ত দায়িত্ব বাবার। যারা সপরিবারে থাকে, তাদের ছেলেমেয়েদের পড়ার খরচ, স্ত্রীদের মাসোহারা এমনকি চাকর-বাকরদের মাইনে পর্যন্ত ফার্মের ফান্ড থেকে দেওয়া হয়। এই বিশাল কর্মযজ্ঞের জন্য বছরে কোটি কোটি টাকা খরচ হয়।

'রেসে কোন্ ঘোড়া জিতবে, তা নির্ভর করে ট্রেনার ও জকির ওপর। ট্রেনার ও জকির বিশ্বাসযোগ্যতার ওপর ভাগ্য নির্ভরশীল। তাই ঘোড়ার মালিকের নিকটতম দুই পার্শ্বচর ট্রেনার ও জকি। ট্রেনার ও জকির মধ্যে

যে-কোনও একজন যদি বিশ্বাসঘাতকতা করে তাহলেই রেসের চিত্র উল্টোপাল্টা হয়ে যাবে। আবার যৌথভাবেও ট্রেনার ও জকি প্যাক্ট হয়ে রেসের ফলাফল বদলে দিতে পারে। ঘোড়ার মালিককে তাই সবচেয়ে বেশি নির্ভর করতে হয় ট্রেনার ও জকির ওপর। মালিকের অঙ্গুলি হেলনে ট্রেনারকে বুঝে নিতে হয় কোন্ ঘোড়াকে জেতাতে হবে, কোন্ ঘোড়াকে দ্বিতীয় স্থানে রাখতে হবে বা কোন্ ঘোড়াকে ইচ্ছাকৃতভাবে কোনও প্লেসে আনা হবে না। ট্রেনার সেইমতো জকিকে নির্দেশ দেয় এবং জকি সেই নির্দেশ পালন করতে বাধ্য। বহু ক্ষেত্রে অন্য মালিকের কাছ থেকে টাকা খেয়ে ট্রেনার ও জকি বিশ্বাসঘাতকতা করে। শিওর উইন ঘোড়ার পিঠ থেকে জকি পড়ে যায় দুর্ঘটনার অজুহাতে। ট্রেনার জকিকে ভুল নির্দেশ দিয়েও ফলাফল আপসেট করে দেয়। সেইসব ক্ষেত্রে সন্দেহের আওতায় পড়লে ট্রেনার ও জকিদের টাকা জরিমানা দিতে হয়। অনেক ক্ষেত্রে তাদের সাময়িক বরখাস্তও করা হয়।

'বুকমেকার ও এজেন্টদের সঙ্গেও অনেক ট্রেনার ও জকির যোগসাজশ থাকে। গোপন ও আপসেট রেসের খবর পাচার হয়ে যায় নিমেষে। সেক্ষেত্রে বুকমেকার ও এজেন্টদের নিজেদের লোক বেশি দরের অফ-ফর্ম ঘোড়ায় বাজি লাগায় এবং মোটা টাকা জিতে নেয়। অনেক সময় শলাপরামর্শ করে ঘোড়ার মালিকরা নিজেদের মধ্যে বোঝাপড়া করে ঠিক করে, কোন্ ঘোড়াকে জেতানো হবে এবং সেই অনুযায়ী নিরেস মানের ঘোড়ার ওপর টাকা লাগায়।

'এতসব কথা তোমাকে জানানোর কারণ—কী বিশাল টাকার খেলা এবং গ্যাম্বলিং চলে এই রেসকে কেন্দ্র করে, সেটা বোঝানোর জন্যে। এইসবের সঙ্গে আমার জীবন কীভাবে জড়িয়ে যায়, সেগুলো বুঝতেও সুবিধে হবে তোমার। তুমি নিজে নিয়মিত রেস খেলো, তবু আমি বলতে পারি, অনেক গূঢ় ব্যাপারের ফন্দি-ফিকির ও ষড়যন্ত্রের কথা লক্ষ লক্ষ পান্টার জানে না, জানতে পারে না।'

আমি নন্দিতার কথা শুনতে শুনতে চোখের সামনে ছবির মতন সব কিছু দেখতে পাচ্ছি। এখনও ওর নিজের আসল কাহিনী শুরু হয়নি।

একটা ব্যাপার আন্দাজ করছি—প্রথম দিন ও আমার সঙ্গে বেশ খানিকটা অভিনয় করেছিল। নিজেকে ভাঙেনি একটুও। আজ যে-কোনও কারণেই হোক, ও নিজেকে উন্মোচন করতে চায় আমার কাছে।

দেখলাম, দুজনের গ্লাসই খালি। কাবাবগুলো ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। আমি দুজনের গ্লাসেই পানীয় ঢেলে জল মিশিয়ে দিলাম। এই ফাঁকে ও উঠে গিয়ে আলমারি খুলে একটা অ্যালবাম বের করে নিয়ে এলো। সেটা আমার পাশে রেখে ও আমার পায়ের কাছে কার্পেটের ওপর বসল। আমার কোলের ওপর কনুই দুটি রেখে দুহাতের তালুতে মুখের ভার রাখল ও। বলল, 'অ্যালবামটা পরে দেখো। আগে সব ঘটনা শোনো, পরে অ্যালবামের চরিত্রগুলো চিনতে সুবিধে হবে।'

একটা চুমুক দিয়ে ও কথা শুরু করল, 'আজ থেকে পঁচিশ বছর আগে কলকাতা থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করে ব্যাঙ্গালোরে হোটেল ম্যানেজমেন্ট পড়তে যায় জাস্টিস দিবাকর রায়চৌধুরির মেয়ে সুজাতা রায়চৌধুরি। বর্ধিষ্ণু পরিবারের রুচিশীলা সম্ভ্রান্ত সুন্দরী সুজাতা। বাপ-মায়ের আদুরে, কিছুটা লাই পাওয়া মেয়ে সুজাতা। লেখা-পড়ার চেয়ে সিনেমা, ফ্যাশন, ক্লাব, হোটেল, খোশ গল্প, ড্রাইভিং, বন্ধু-বান্ধব নিয়ে উইক-এন্ড কাটানোর দিকে ঝোঁক বেশি। স্বভাবতই উচ্চ মাধ্যমিকে কোনওক্রমে সেকেন্ড ডিভিসনে উতরে যায় সুজাতা। কলকাতায় পছন্দসই কোনও সুযোগ না পেয়ে সুজাতাকে বাধ্য হয়ে ব্যাঙ্গালোর যেতে হয় কেরিয়ার তৈরি করার উদ্দেশে।

'ব্যাঙ্গালোরে এসে সুজাতা আরও একটি বিনোদনের স্বাদ পেলো, যা তার অন্যান্য আমোদ-প্রমোদের উপাদানগুলোকে কিছুটা ম্লান করে দিল। সেটা হল রেসের মাঠ। রেসের মাঠের উত্তেজনা, গ্ল্যামার, মদ্যপান, নারীপুরুষের অবাধ মেলামেশা দ্রুত আচ্ছন্ন করে সুজাতাকে। রেসের মাঠে যেমন শাঁসালো পুরুষ পাকড়াবার জন্যে শিকারি মেয়েরা ঘোরে, তেমনই সুজাতাদের মতন যৌবনবতী সুন্দরী বড়লোকের দুলালি মেয়েদের ফাঁদে ফেলার জন্যে অনেক দালাল ওত পেতে থাকে। সেইসব দালালরা সুবেশ, সুদর্শন স্মার্ট পুরুষ। তাদের হাতে অনেক সময় ভালো বাজির টিপ্‌স্ থাকে। সেই রকম এক দালালের খপ্পরে পড়ে সুজাতা। প্রথম

প্রথম সে সুজাতার কাছাকাছি থেকে দেখাতে শুরু করে, সে অবিরাম বাজিমাৎ করে যাচ্ছে। তারপর একটু একটু করে ভাব জমায় ওর সঙ্গে। একদিন ওকে একটা শিওর উইনের টিপ্‌স্‌ দিল। বাজিটা ছিল গট-আপ। দশের দরে আপসেট ঘোড়া জিতে গেল। পাঁচশো টাকা খেলে সুজাতা পাঁচ হাজার টাকা পেয়ে গেল। এইভাবে টিপ্‌স্‌ দিতে দিতে সে সুজাতার ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠল। ওকে নিয়ে শুরু হল ঘোরাঘুরি। ক্লাব, হোটেল, সিনেমা, মদ্যপান নিয়ে মেতে উঠল সুজাতা। সুযোগ বুঝে ওকে একদিন বিছানায় শোয়ালো সে। সুজাতা সেই সঙ্গ দারুণভাবে উপভোগ করল। শুরু হল নিয়মিত স্বাধীন সঙ্গম। অল্পদিনের মধ্যেই গর্ভবতী হল সুজাতা। ব্যাপারটা গোপন রইলো না ওদের হস্টেলে। ওকে হস্টেল ছাড়তে হল। তখন ও পুরোপুরি দালালটির হাতের মুঠোয়। ওকে মোটা টাকায় বেচে দেবার ফিকির খুঁজছে সে।

'প্রথমে সে সুজাতাকে একটা দামী হোটেলে থাকার ব্যবস্থা করে দিল। তারপর একদিন নিয়ে গেল ডাক্তারের কাছে, পেট খসানোর জন্য। ডাক্তারটি ব্যাঙ্গালোর টার্ফ ক্লাবের সদস্য। ভদ্রলোক রেসের মাঠে সুজাতাকে দেখেছেন। দালাল ছেলেটিও তাঁর চেনা। ইতিপূর্বে সে আরও কয়েকটি মেয়ের পেট খসাতে এসেছে। সুজাতাকে দেখে তাঁর সন্দেহ হয়। তিনি ওকে আড়ালে ডেকে কিছু কিছু প্রশ্ন করেন এবং নিশ্চিত হন, সুজাতা অথৈ জলে পড়েছে। সুজাতার অন্ধকার ভবিষ্যতের কথা ভেবে তিনি শঙ্কিত হন। তিনি ভাবতে শুরু করেন কীভাবে ওকে রক্ষা করা যায়। ওকে পরীক্ষা করে তিনদিন পরে নিয়ে আসতে বললেন।

'তিনদিনের মধ্যে তিনি সুজাতার জন্যে পাকাপাকি একটা ব্যবস্থা করে ফেললেন। তিনদিন পরে সুজাতা এলো। তিনি দালাল ছেলেটিকে বললেন, সন্ধ্যার পরে এসে ওকে নিয়ে যেতে। একবেলা রেস্ট নেওয়া দরকার। সে ফিরে যেতে তিনি সুজাতাকে তাঁর সন্দেহ, অনুমান ও আশঙ্কার কথা জানান। ভেতরে ভেতরে সুজাতা একটা গভীর ষড়যন্ত্রের আতঙ্কে দুলছিল। ডাক্তারের কথা শুনে সে সম্পূর্ণ ভেঙে পড়ে। ডাক্তার ওকে গোপনে কলকাতায় ফিরে যেতে পরামর্শ দেন। কিন্তু সুজাতা রাজি হয় না। সে কোন্‌ মুখে বাবা-মায়ের সামনে গিয়ে দাঁড়াবে! তখন ডাক্তার ওকে একটি

সমাধানের পথ দেখান। আগে থেকেই তিনি একটা বিহিত করে রেখেছিলেন, জানালেন ওকে।

'সুজয় মালিয়ার স্টাড ফার্মের রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত এক দায়িত্বশীল ব্যক্তির সঙ্গে ডাক্তার আগেই কথা বলে রেখেছিলেন। সুজাতার কথা এবং তার আসন্ন বিপদের আশঙ্কার কথা তিনি জানিয়েছিলেন ভদ্রলোককে। সুজাতাকে এই ষড়যন্ত্রের হাত থেকে বাঁচানোর একটা উপায় বের করেন ভদ্রলোক। তিনি ডাক্তারকে কথা দেন, নিতান্তই নিরুপায় হলে তিনি সুজয় মালিয়ার ঘোড়ার সাম্রাজ্যে সুজাতার একটা ব্যবস্থা করে দেবেন। সেখানে থাকা-খাওয়ার সুবন্দোবস্ত আছে। ভদ্রলোক সেখানে ওকে একটা পাকাপাকি কাজের ব্যবস্থাও করে দেবেন।

'সব শুনে সুজাতা আশার আলো দেখতে পায়। ও এককথায় রাজি হয়ে গেল। ডাক্তার সঙ্গে সঙ্গে ওকে অপারেশনের ব্যবস্থা করেন। দু ঘণ্টা বিশ্রাম দিয়ে নিজের গাড়ি করে ওকে পাঠিয়ে দেন সুজয় মালিয়ার সেই ভদ্রলোকের কাছে। পাঠানোর আগে টেলিফোনে জানিয়ে দেন সব কিছু।

'দালাল ছেলেটি সুজাতাকে নিতে এলে ডাক্তার জানিয়ে দেন, সুজাতা নিজে পুলিশ হেড কোয়ার্টারে ফোন করে নিরাপত্তার আর্জি জানায় এবং হেড কোয়ার্টার থেকে পুলিশ এসে ওকে নিয়ে যায়। শুনে ছেলেটি পালাবার পথ পায় না। কোনওরকম বিতর্কে না গিয়ে সে সোজা কেটে পড়ে।

'সুজয় মালিয়ার ঘোড়ার সাম্রাজ্যে আশ্রয় পেল সুজাতা। শুরু হল তার নতুন জীবন। বাড়িতে চিঠি দিয়ে সুজাতা জানিয়ে দিল, তাকে আর টাকা পাঠাবার দরকার নেই। সে একটা ভালো কাজ পেয়ে বম্বে চলে গেছে। প্রয়োজন হলে সে যোগাযোগ করবে।

'কিন্তু সুজাতার বাবা জাস্টিস দিবাকর রায়চৌধুরি বিচক্ষণ ও ক্ষমতাবান মানুষ। তিনি সুজাতার আচরণে নিঃসন্দেহ হতে পারলেন না। একটা গণ্ডগোলের পূর্বাভাস তাঁকে সচকিত করল। তিনি মহারাষ্ট্র ও কর্ণাটকের গোয়েন্দা পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাঁর সন্দেহের কথা জানালেন। দুটি রাজ্যেই চিরুনি তল্লাশি শুরু হল। কিন্তু সুজয় মালিয়ার তুরঙ্গম তীর্থ

এতটাই সুরক্ষিত যে সেখানে পুলিশের পক্ষে হানা দেওয়া বা সেখানে সুজাতার অবস্থানের কথা কল্পনা করা—কোনওটাই সম্ভব নয়।

'এরপর দুটি রাজ্যেই নামকরা সব দৈনিকে ও টিভি-তে সুজাতার ছবি দিয়ে প্রচার শুরু হল সন্ধান দেবার জন্য। আশ্রয়দাতা ভদ্রলোক তৎপর হলেন। তিনি সমস্ত ব্যাপারটা সুজয় মালিয়াকে জানিয়ে সুজাতার সুরক্ষা ও নিরাপত্তার বিশেষ ব্যবস্থা নিতে অনুরোধ করলেন। সুজয় মালিয়া প্রথমে রাজি হননি। পরে সুজাতাকে দেখে তিনি মত পাল্টান। সুজাতার রূপ-লাবণ্য ও ঠাসা যৌবনের প্রতি আকৃষ্ট হন তিনি। তুরঙ্গম নগরী থেকে সুজাতাকে সরিয়ে নিজস্ব দুর্গে সুরক্ষিত করলেন ওকে। সব রকম ধরা-ছোঁয়ার বাইরে চলে গেল সুজাতা।

'তখন থেকেই সুজয় মালিয়ার সঙ্গে তার একান্ত গোপন সম্পর্ক স্থাপিত হয়। প্রমোদবিলাসে মজে গেলেন সুজয় মালিয়া। কাজের অনেক ক্ষতি স্বীকার করেও তিনি সুজাতাকে চক্ষে হারাতে পারেন না। শারীরিক ও মানসিক—দুদিক থেকেই বাঁধা পড়লেন তিনি সুজাতার কাছে। সুজাতার প্রেমে ভেসে গেলেন তিনি। দ্বিতীয়বার গর্ভবতী হল সুজাতা।

'একবছর পরে বম্বের এক বিখ্যাত ক্লিনিকে আমার জন্ম হয়। আমার ছ'মাস বয়সে মাকে আমার থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়। তুরঙ্গম নগরীতে মাকে পাঠিয়ে দেওয়া হয় নজরদারি করতে। জনা পঞ্চাশেক নারী-পুরুষ মায়ের হেপাজতে কাজ করে। চারজন মহিলার তত্ত্বাবধানে আমি বড় হতে লাগলাম অন্যত্র।

'তুরঙ্গম নগরীতে একজন ট্রেনারের সঙ্গে মায়ের ভাব হয়। ঘোড়া সম্পর্কে বহু তথ্য মায়ের জ্ঞানভাণ্ডারে জমা হতে থাকে। কীভাবে ঘোড়াকে ট্রেনিং দেওয়া হয়, কেমন রাজকীয় মর্যাদায় তাদের পরিচর্যা করা হয়, নিয়মিত ব্যায়াম, ম্যাসাজ, খাওয়ানো, বিশ্রাম দেওয়া—সব ব্যাপারেই মায়ের ধারণা স্পষ্ট হতে থাকে। এক সময়ে মা ঘোড়ায় চড়তে শুরু করল। জকিরা মাকে শেখায়, কীভাবে ঘোড়াকে দৌড় করাতে হয়। ক্রমশ মা তুরঙ্গম নগরীতে খুবই জনপ্রিয় ও সকলের প্রিয় পাত্রী হয়ে উঠল। দেখতে দেখতে একদিন তুরঙ্গম নগরীতে রানীর মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হল মা।

সুজাতা দারুণভাবে উপভোগ করল ওর সঙ্গ—শুরু হল নিয়মিত স্বাধীন সঙ্গম

'বিশাল প্রাচুর্য ও বৈভবের মধ্যে আমি তখন বড় হচ্ছি। স্কুলের গণ্ডি পেরিয়ে পড়াশুনোয় ইস্তফা দিলাম। বাবা আমাকে রেসিং ওয়ার্ল্ডের সঙ্গে যোগাযোগ ঘটিয়ে দিল। কলকাতা, বোম্বাই, পুনে, ব্যাঙ্গালোর, মাইশোর, চেন্নাই— সমস্ত টার্ফ ক্লাবে বিশেষ অতিথি হিসেবে আমন্ত্রণ পেতে লাগলাম। যেখানেই যাই, রানীর মর্যাদায় সমাদৃত হই। সব জায়গায় ঘুরে ঘুরে রেস দেখলাম। রেসিং ওয়ার্ল্ডের বিশিষ্ট বরেণ্য ব্যক্তিদের সঙ্গে পরিচিত হলাম।

'কিছুদিন পরে ব্যাঙ্গালোরে ঘোড়-সাম্রাজ্যের দায়িত্ব নিতে বলল বাবা। মাকে তখন কলকাতায় নিউ আলিপুরের বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়েছে বাবা। ছোটবেলা থেকে আমি জানি, আমার মা নেই। আমায় জন্ম দিয়েই মা মারা গেছে। বাবার অন্য স্ত্রী আছে, সন্তানাদি আছে—তাদের সঙ্গে আমার বিশেষ যোগাযোগ নেই। আমি আমার নিজস্ব জগতে মহারানীর মতন বিচরণ করি।

'ব্যাঙ্গালোরে ঘোড়াদের রাজগৃহে পৌঁছে আমি দিশেহারা হয়ে পড়ি। এত বিশাল তুরঙ্গম নগরী, তার সংলগ্ন 'রাইডার্স কমপ্লেক্স', সেখানকার বিশাল কর্মযজ্ঞ আমার চোখে নতুন চমক। বাবা নিজে সেখানকার কর্তা-ব্যক্তিদের সঙ্গে আমাকে পরিচয় করিয়ে দিল। আমি নন্দিতা মালিয়া, সুজয় মালিয়ার কন্যা সেই এস্টেটের পুরো দায়িত্ব নিলাম। আমি সকাল থেকে রাত পর্যন্ত গাড়ি নিয়ে অথবা ঘোড়ায় চেপে সবকিছু পর্যবেক্ষণ করি।

'একদিন মধ্যবয়স্কা এক মহিলা আচমকা আমাকে জিজ্ঞেস করল, মালকিন, রানীমা আপনার কে হন?

'আমি রানীমা বলে কাউকে চিনি না। পাল্টা প্রশ্ন করলাম তাকে, কে রানীমা? রানীমা বলে আমি তো কাউকে চিনি না!

'মহিলাটি বলল, সেকি! রানীমাকে আপনি চেনেন না? আপনার আগে উনিই তো এখানকার মালকিন ছিলেন। এখানকার সমস্ত কর্মচারি ওঁকে রানীমা বলে ডাকত। ঠিক আপনার মতন দেখতে। এখানে অনেকেই বলাবলি করছে, রানীমা নিশ্চয়ই আপনার মা। আপনার হাঁটা, চলাফেরা, তাকানো, কথা বলা—সবই হুবহু রানীমার মতন। এমন আশ্চর্য মিল কী করে হয়!

'মহিলাটিকে বললাম, তাই নাকি? কিন্তু আমার তো মা নেই। রানীমা এখন কোথায়?

'মহিলাটি বলল, তা তো জানি না। আপনি আসার কয়েকদিন আগে তিনি হঠাৎ উধাও হয়ে যান। কেউ জানে না, তিনি কেন চলে গেলেন, কোথায় চলে গেলেন।

'এর উত্তর আমার জানা নেই। কিন্তু একটা রহস্যের ইঙ্গিত আমাকে রীতিমতো ভাবিয়ে তুলল। রাতে আমি এস্টেটের বয়স্ক ম্যানেজারকে ডেকে এ-ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করলাম। তিনি প্রথমে বিষয়টির গুরুত্ব না দিয়ে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করেন। পরে চেপে ধরতে তিনি শুধু জানালেন, রানীমা এখানকার সর্বময় কর্ত্রী ছিলেন। তাঁর সম্পর্কে কিছু জানতে হলে খোদ মালিককে জিজ্ঞেস করাই ভালো। তিনিও স্বীকার করলেন, সবদিক থেকেই রানীমার সঙ্গে আমার নাকি আশ্চর্য মিল!

'রাতেই বাবাকে ফোন করলাম বম্বেতে। রানীমার কথা জিজ্ঞেস করতে বাবা জানাল, রানীমা এখন কলকাতায় নিউ আলিপুরের বাড়িতে আছেন। তাঁর সম্পর্কে কিছু বলতে বাবা রাজি হল না। শুধু বলল, আমি ইচ্ছে করলে কলকাতায় গিয়ে ওঁর সঙ্গে দেখা করতে পারি। যদি কিছু বলার থাকে উনিই বলবেন।

'রানীমা সম্পর্কে আমার কৌতূহল দ্বিগুণ বেড়ে গেল। তাঁকে জানার আগ্রহে আমি উড়ে এলাম কলকাতায়। নিউ আলিপুরের বাড়িতে পৌঁছে তাঁকে দেখে আমি চমকে উঠলাম! তিনি কিন্তু আমাকে দেখে এতটুকু বিচলিত হলেন না। একেবারে নির্বিকার। আমাকে বললেন, তোমার মনের কথা আমি জানি। তোমার বাবা আমাকে ফোন করেছিলেন। এখানে কয়েকদিন তুমি আমার কাছে থাকো। তোমার সঙ্গে অনেক কথা আছে।

'আমি অধৈর্য হয়ে জিজ্ঞেস করে ফেললাম, আপনি কি আমার মা?

'মলিন হেসে তিনি জানালেন, হ্যাঁ।

'বিহ্বল আবেগে আমার ভেতরটা তোলপাড় করে উঠল। আমি ঝাঁপিয়ে পড়লাম মায়ের বুকে।'

কথার ফাঁকে ফাঁকে আমরা পানীয় ঢেলে নিচ্ছি। এতক্ষণে দুজনে বোতলের প্রায় অর্ধেক খালি করে ফেলেছি। নন্দিতা বলল, 'এতোক্ষণ

শুধু নিজের কথাই বলে যাচ্ছি। তোমাকে কিছু বলতে দিচ্ছি না। কথা বলতে শুরু করলে শেষ আর হতে চায় না। তুমি বোধ হয় বোর হচ্ছো।'

আমি বললাম, 'একেবারেই না। ছেলেবেলায় রূপকথা শোনার মতন বিস্ময়ঘোর লাগছে।'

ও বলল, 'ইচ্ছে হলে তুমি আজ এখানে থেকে যেতে পারো। রাতের খাবারটা টেলিফোন করে আনিয়ে নিতে কোনও অসুবিধে হবে না।'

আমি বললাম, 'তোমার তো একটাই ঘর। দুজনে থাকব কোথায়?'

ও বলল, 'কেন, বিছানাটা তো ডবলবেডের। বলেছ না, আমার জন্যে নিজেকে ভাঙাতে চাও?'

ওর সরল নিবেদনে প্রণয়তৃষ্ণায় আমি ব্যাকুল হয়ে উঠলাম। জবাব না দিয়ে ওকে বুকে টেনে নিলাম। দুমিনিট খুব মনোযোগ দিয়ে আদর করলাম ওকে। ও খুব আগ্রহের সঙ্গে বলল, 'থাকছ তো তাহলে?'

আমি সম্মতি জানাতে ও জিজ্ঞেস করল, 'কী খাবে রাতে?'

আমি বললাম, 'বিশেষ কিছু নয়। কাবাবটা গরম করে নিলে ওটাই তো দুজনের হয়ে যাবে।'

ও বলল, 'আমার কোনও অসুবিধে হবে না। তোমার জন্যেই ভাবনা।'

খালি গ্লাস ভরে নিলাম আমরা। আমি বললাম, 'তারপর বলো।'

ও শুরু করল, 'মার কাছে আনুপূর্বিক সমস্ত ঘটনা পুঙ্খানুপুঙ্খ শোনার পর প্রশ্ন করলাম, তুমি এই অপমানকর জীবন মেনে নিলে কি করে?

'মা বলল, তোমার বাবা নিজের বিয়ে করা স্ত্রীর চেয়েও বোধ হয় আমাকেই বেশি ভালোবাসেন। উনি আমাকে অমর্যাদায় রাখেননি। বিয়ে করে স্বীকৃতি দেওয়া ওঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। এ-ব্যাপারে আমার কোনও ক্ষোভ নেই।

'আমি জিজ্ঞেস করলাম, তোমার কাছ থেকে আমাকে ছিনিয়ে নিয়ে উনি কি ঠিক করেছেন?

'মা বলল, উনি ছিনিয়ে নেননি। তোমাকে মেয়ে হিসেবে স্বীকৃতি দেবার জন্যেই আমাকে দূরে সরে যেতে হয়। একটা বয়েস পর্যন্ত ইচ্ছে করেই তোমার সঙ্গে আমার যোগাযোগ ঘটানো হয়নি। আমার অমতে উনি কিছুই করেননি।

'মায়ের মনে ক্ষোভ না থাকলেও আমি খুশি হতে পারিনি। জীবনটাকে শৃঙ্খলহীন এলোমেলো ভাসিয়ে দেবার একটা প্রবণতা দেখা দিল আমার মধ্যে। তিনদিন পরে ফিরে এলাম ব্যাঙ্গালোরে। সকলকে সগর্বে জানিয়ে দিলাম, রানীমা আমারই মা। যে যা খুশি ভাবুক, এ-সত্য আমি চাপা রাখিনি। বাবার প্রতি একটা চাপা ঘৃণা চেপে বসল আমার ভেতরে।

'কিছুদিনের মধ্যেই জে. পাটিল নামে একজন জকির সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা হয়। সকালে ঘোড়াকে স্পার্ট ও গ্যালপ করাবার পর পাটিল আমাকে অনুশীলন করায়। একই ঘোড়ায় আমরা দুজনে চেপে ঘুরি। ও বিয়ে করেনি। রাইডার্স মেসে ও থাকে। অবিবাহিত জকিরা মেসেই থাকে।

'আমি ওর প্রেমে পড়লাম। অবসর সময়ে আমরা বাইরে দেখা করি। হোটেল রেস্তোরাঁ ক্লাব সিনেমায় যাই। ওকে প্রকাশ্যেই আমার ঘরে আসার অনুমতি দিলাম। আমরা পরস্পরকে নিবিড়ভাবে আলিঙ্গন করি। প্রোটেকশন নিয়ে বেশ কয়েকবার মিলিত হলাম আমরা। আমরা বিয়ে করব—সিদ্ধান্ত নিলাম।

'পাটিলের সঙ্গে কলকাতা, বোম্বাই ঘুরে বেড়াই। প্রত্যেকটা রেসে গ্যালারি থেকে ওকে উৎসাহিত করি। একবার কলকাতায় মরিসাস কাপের বাজিতে পাটিল 'ফ্লাই টু উইন'-এর রাইডার। টপ ফেভারিট ঘোড়া 'ফ্লাই টু উইন'। হাইয়েস্ট পুল হয়েছে ওই ঘোড়ার ওপর। বারোশো মিটারের দৌড়। প্যাডক থেকে বেরুবার মুখে আমি ওকে উইশ করলাম। ছ'টা ঘোড়া স্টার্টিং পয়েন্টের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। মেম্বার্স গ্যালারিতে ক্লোজসার্কিট টিভি-তে দেখছি আমি। যথাসময়ে খাঁচায় ঢুকে গেল ছটা ঘোড়া। তিন নম্বর ড্র-তে 'ফ্লাই টু উইন'-এর পিঠে পাটিল।

'রেস শুরু হল। প্রথম থেকেই পাটিল তিনটে ঘোড়ার পেছনে। ফার্স্ট বেন্ড ঘোরার পর ও তিন নম্বরে এসে গেল। ফাইনাল বেন্ড নিয়ে ডিসট্যান্ট পোস্টে পৌঁছে ও দু নম্বরে। সেখান থেকে দুরন্ত গতিতে গ্যালপ করিয়ে ও যখন এক নম্বরে তখন দ্বিতীয় ঘোড়ার থেকে চার লেংথে এগিয়ে। উত্তেজনায় আর চিৎকারে গ্যালারি ভেঙে পড়েছে। উইনিং পোস্টে পৌঁছবার

ঠিক আগের মুহূর্তে পাটিল ছিটকে গেল ঘোড়া থেকে। 'ফ্লাই টু উইন' উইনিং পোস্ট ছাড়িয়ে গেল। ঘোড়া জিতেছে কিন্তু ডিসকোয়ালিফায়েড। দ্বিতীয় ঘোড়া উইন পেল। কিন্তু কেউ-ই বুঝতে পারেনি, চার নম্বর ঘোড়ার পিছনের পায়ের একটা লাথি সজোরে আঘাত করেছে পাটিলের বুকে। অচৈতন্য অবস্থায় পাটিল পড়ে আছে রেলিং-এর গায়ে, উইনিং পোস্ট থেকে মাত্র দশ ফুট আগে। স্ট্রেচারে তুলে পাটিলকে ড্রেসিং রুমে আনা হল। ভলভল করে রক্ত বেরুচ্ছে পাটিলের মুখ থেকে। সঙ্গে সঙ্গে অ্যাম্বুলেন্সে তুলে পাটিলকে পাঠানো হল কম্যান্ড হসপিটালে।

'এক ঘণ্টাও বাঁচেনি পাটিল। হৃৎপিণ্ডটা থেঁতলে গিয়েছিল।'

জিজ্ঞেস করলাম, 'আর কোনো পুরুষ আসেনি তোমার জীবনে?'

ও বলল, 'এসেছে। বছরখানেক আগে। তখন আমি ব্যাঙ্গালোরে। সম্পর্ক হয়েছিল একজন ট্রেনারের সঙ্গে। তার নাম শ্যাম চিস্টি। শ্যামের সঙ্গে আমার প্রেম হয়নি। ওর পৌরুষ আমাকে আকর্ষণ করেছিল। আমার রূপ-যৌবনে ও মুগ্ধ হয়েছিল। কিন্তু সুজয় মালিয়ার মেয়েকে প্রেম নিবেদন করার সাহস হয়নি শ্যামের। শ্যাম বিবাহিত। বয়স তিরিশের বেশি। ওর চোখের ভাষা পড়তে অসুবিধা হয়নি আমার। ওকে প্রশ্রয় দিই। ওর সঙ্গে নিয়মিত শারীরিক সম্পর্ক স্থাপিত হল। পরস্পর পরস্পরকে উপভোগ করি।

'সেই সময় শ্যাম লন্ডন থেকে একজন জকিকে আনায়। তার নাম ডেভিড মার্শাল। অসাধারণ রাইডিং ডেভিডের। শ্যাম তখন বুঝতে পারে নি, খাল কেটে কুমির ঢুকিয়েছে ও। আমাকে দেখে ডেভিড সরাসরি প্রেম নিবেদন করে বসল। আমিও জড়িয়ে গেলাম ডেভিডের সঙ্গে। শ্যামকে ছেড়ে তখন ডেভিডের সঙ্গে আমার মাখামাখি। ডেভিড আমার জীবনে তিন নম্বর পুরুষ। ছোটখাট পেটা চেহারা ডেভিডের। বয়স পঁচিশ-ছাব্বিশ। আমার চেয়ে তিন-চার ইঞ্চি মাথায় ছোট। কিন্তু বিছানায় ওর দাপট আসুরিক। ও যে-ঘোড়ার পিঠেই চড়ে তাকে সর্বাগ্রে উইনিং পোস্টে পৌঁছে দেয়। আমার মনে হল, মেয়েমানুষের ক্ষেত্রেও ওর অভিজ্ঞতা অপার। যার ওপর চড়বে, দ্রুততম গতিতে তাকে শীর্ষসুখে পৌঁছে দেবে। শ্যামের হাতবদল হয়ে আমি ডেভিডের হয়ে গেলাম।

'ডেভিডের আগমনে রেসিং ওয়ার্ল্ডের পট পরিবর্তন হয়ে গেল। ডেভিড যে-ঘোড়ায় চাপে, সে-ই উইন করে। কেউ আর ঘোড়া, তার বংশ-পরিচয়, তার ট্রেনার বা মালিকের ফিরিস্তি নিয়ে মাথা ঘামায় না। সকলের লক্ষ্য একদিকে—ডেভিড মার্শাল কোন্ ঘোড়ার রাইডার। সে-ঘোড়াই অবধারিত জিতবে।

'ডেভিড তখন থাকত একটা মাঝারি মানের হোটেলে। রাইডার্স মেসে তখনও জায়গা পায়নি। সকালে হোটেল থেকে গাড়ি চালিয়ে আসত ঘোড়াকে অনুশীলন করাতে। আবার ফিরে যেত হোটেলে। একদিন অনুশীলন শেষ করে হোটেলে ফিরছে। পথে মুখোমুখি একটা ট্রাকের সঙ্গে সংঘর্ষ হল। সকলের চোখে এটা দুর্ঘটনা। আসলে চেন্নাস্বামী, বিশিষ্ট ঘোড়ার মালিক ইচ্ছাকৃতভাবে এই দুর্ঘটনা ঘটায়। উদ্দেশ্য, ডেভিডকে খতম করা। কেননা, সেই মরশুমে চেন্নাস্বামীর একটা ঘোড়াও উইন পায় নি।

'দুর্ঘটনায় ডেভিড মরেনি। কিন্তু ওর ডান হাতটা কাটা যায়। জীবনের মতন রাইডিং শেষ হয়ে গেল। পঙ্গু ডেভিড দেশে ফিরে যেতে চেয়েছিল। কিন্তু ওকে আমি যেতে দেইনি। বিয়ে করে ওকে সারাজীবন আটকে রাখতে চেয়েছিলাম। কিন্তু তাতে ওর পৌরুষে লাগে। ও রাজি হয়নি। রেসিং ওয়ার্ল্ডের সঙ্গে সব সম্পর্ক ছিন্ন করতে ও তখন বদ্ধপরিকর। তখন বাবার সঙ্গে পরামর্শ করে ওকে আসামের একটা চা-বাগানে কাজের ব্যবস্থা করে দিই। মাসে একবার করে গুয়াহাটি যেতাম। দুদিন থাকতাম ওর সঙ্গে। কিন্তু ও আর কখনও আমাকে স্পর্শ করেনি। রাইডিং-এর সঙ্গে সঙ্গে নারী-সংসর্গও বর্জন করে ও।

'গত পরশুদিন রেসের মাঠ থেকে ফিরে খবর পেলাম ডেভিড অসুস্থ। ওর বস্ মিঃ বরুয়া ফোন করে জানিয়েছে, অসুস্থ অবস্থায় ওকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে এয়ারলাইন্স্-এ ফোন করে গতকালের টু অ্যান্ড ফ্রো টিকিটের ব্যবস্থা করে সকালের ফ্লাইটে উড়ে যাই গুয়াহাটি। এয়ারপোর্ট থেকে চা-বাগান চল্লিশ মাইল। ডেভিডের বস্কে ফ্লাইট সিডিউল জানিয়ে গাড়ি পাঠাতে বলেছিলাম। এয়ারপোর্ট

থেকে সোজা হাসপাতালে গেলাম। সেখানে অর্ধমৃত ডেভিড মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করছে। ইঞ্জেকশন, স্যালাইন, অক্সিজেন চলছে আই. সি. সি. ইউ-তে। ঘটনা শুনলাম, পরশুদিন দুপুরে ডেভিড অত্যধিক মদ্যপান করে গুচ্ছের ঘুমের বড়ি খায়। পরিষ্কার আত্মহত্যার চেষ্টা। অচৈতন্য অবস্থায় ওকে হাসপাতালে আনা হয়। বাহাত্তর ঘণ্টা না-কাটা পর্যন্ত ডাক্তাররা কিছু বলতে পারছেন না।

'আমি ওখান থেকে চা-বাগানের গেস্টহাউসে পৌঁছে হাল্কা লাঞ্চ সেরে কিছুটা বিশ্রাম নিয়ে ফিরে আসি এয়ারপোর্টে। সেখান থেকে তোমাকে ফোন করি। বোর্ডিং পাশ নিয়ে সিকিউরিটি এনক্লোজারে পৌঁছে গিয়েছি। তখনই মাইক্রোফোনে ঘোষকের গলা ভেসে এলো—হিয়ার ইজ অ্যান অ্যানাউন্সমেন্ট ফর মিস এন. মালিয়া লিভিং গুয়াহাটি ফর ক্যালকাটা। মিঃ বরুয়া হ্যাজ রিকোয়েস্টেড ইউ টু ক্যানসেল ইয়োর জার্নি অ্যান্ড টু গো ব্যাক টু দ্য টি-গার্ডেন। মিস্টার ডেভিড মার্শাল হ্যাজ ডিপার্টেড সামটাইমস ব্যাক। থ্যাঙ্ক য়ু।

'ফ্লাইট না-ছাড়া পর্যন্ত গাড়িটা রাখতে বলেছিলাম। জার্নি ক্যানসেল করে তোমার অফিসে ফোন করে ওই গাড়িতেই আবার ফিরে গেলাম। ডেভিডের বডি পোস্টমর্টেম করে দিতে দিতে মাঝরাত হয়ে গেল। ওর অন্ত্যেষ্টি সেরে যখন ফিরলাম তখন আলো ফুটে গিয়েছে। সকালের ফ্লাইটে কলকাতায় ফিরে এলাম। গুয়াহাটির পাট চুকে গেল।'

বিষাদের মেঘে ঢেকে গেল নন্দিতা। ঘড়িতে সাড়ে নটা বেজেছে। ভাবলাম, বাড়ি ফিরে যাই। মুহূর্তেই মনে হল, নন্দিতাকে একা ফেলে রেখে যাওয়া ঠিক হবে না। ও এখানে থাকতে চায় আমাকে নিয়ে। আমি কি ওর জীবনে চতুর্থ পুরুষ হতে চলেছি? বোধহয় তা-ই। অনিবার্যভাবেই ও আমাকে আঁকড়ে ধরতে চায়।

আমি বাড়িতে ফোন করে খবর দিলাম। জানিয়ে দিলাম, একটা কাজে ফেঁসে গেছি, কাল সকালে ফিরব।

আমার মুখের দিকে তাকিয়েছিল নন্দিতা। টেলিফোনটা রাখতেই ওর নিভে যাওয়া মুখে আলো ফুটে উঠল। আমাকে জিজ্ঞেস করল, 'কাকে ফোন করলে বাড়িতে?'

আমি বললাম, 'বাড়িতে আমার জোড়া বউ আছে। একজনকে জানিয়ে দিলাম।'

ও অবিশ্বাসের চোখে আমাকে দেখে বলল, 'বাজে কথা।'

আমি বললাম, 'না। বিয়ের আগে ওদের দুজনকেই একসঙ্গে দেখি রেসের মাঠে। তারপর—'

ঘটনাটা সংক্ষেপে বললাম ওকে। ও বলল, 'তোমার সব কিছুই কি রেসের মাঠকে কেন্দ্র করে?'

বললাম, 'তা বলতে পারো। রেসের মাঠে না গেলে কি তোমাকে পেতাম? দাদুর ডাইরি পড়ে জানতে পারি, ওঁর জন্ম হয়েছিল ঘোড়াশালে।'

ও অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'ঘোড়াশালে? মানে আস্তাবলে? কেন?'

আমি বললাম, 'দাদু ডাইরিতে আমাদের বংশ-পরিচয় লিখে রেখে যান। সেটা পড়ে জানতে পারি, দাদুর বাবা ছিলেন ব্রিটিশ। তার মানে আমার শরীরেও ব্রিটিশের রক্ত। দাদু ছিলেন হর্স-ট্রেনার ও একনম্বর রাইডার।'

ও আরও অবাক ও কৌতূহলিত হয়ে বলল, 'কিছুই বুঝতে পারছি না। তুমি তো সিন্‌হা। ব্রিটিশ রক্ত, আস্তাবলে জন্ম—খুলে বলো সব।'

আমি বললাম, 'স্যার উইলিয়াম স্মিথ নামে একজন প্রভাবশালী ইংরেজের শ'খানেক রেসের ঘোড়া ছিল। আমার প্রপিতামহ, মানে দাদুর বাবা সেই সাহেবের হেপাজতে ঘোড়ার দেখভাল করতেন। ওঁর নাম ছিল রাজেন্দ্র সিন্‌হা। স্ত্রী হীরাবালাকে নিয়ে রাজেন্দ্র সাহেবের আউট হাউসে বাস করতেন।

'রাজেন্দ্রর সঙ্গে ট্রেনার ও জকিদের সম্পর্ক ভালো ছিল। এবং এর প্রধান কারণ হীরাবালা। হীরাবালা তখন ষোলো বছরের এক অগ্নিশিখা। ফেটে পড়া রূপ আর ঠাসাঠাসি যৌবন। রাজেন্দ্রর সঙ্গে হীরাবালাও ঘোড়াদের পরিচর্যা করতেন, রাজেন্দ্রকে সাহায্য করতেন। একজন ট্রেনার ও জকি পরামর্শ করে রাজেন্দ্রকে ঘোড়ায় চড়ানো শেখাতে চায়। রাজেন্দ্র খুবই উৎসাহিত হন। মাঝে মাঝে সেই ট্রেনার ও জকি রাজেন্দ্রকে ঘোড়ায় তুলে তালিম দিত। একটা আনকোরা ঘোড়ার ট্রেনিং-এর প্রস্তুতি চলছিল। রাজেন্দ্রকে একদিন সেই ঘোড়ার পিঠে চাপিয়ে ট্রেনার ল্যাজের নিচে

সুড়সুড়ি দিল আর জকি পাছায় দু ঘা ছপ্‌টি চালিয়ে দিল। মুহূর্তে ঘোড়াটা এলোপাথাড়ি ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে শুরু করে। দিশেহারা রাজেন্দ্র ঘোড়াটাকে আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করেন। ঘোড়াটা লাফিয়ে সজোরে একটা ঝটকা দিতেই রাজেন্দ্র ছিটকে যান। ঘোড়াটার পিছনের দুটি পা রাজেন্দ্রকে পিষে দিয়ে ল্যাজ তুলে ধাঁ। মুমূর্ষু অবস্থায় রাজেন্দ্রকে হাসপাতালে পাঠানো হয়। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই রাজেন্দ্র ইহলোক ত্যাগ করেন।

'গোটা ঘটনাটা হীরাবালার চোখের সামনেই ঘটে। হীরাবালার সঙ্গে কথা বলতেই সাহেবের কাছে সব কিছু পরিষ্কার হয়ে যায়। সাহেব ওই ট্রেনার ও জকিকে বরখাস্ত করেন। অসহায়, বালবিধবা হীরাবালাকে নিজস্ব জিম্মায় সুরক্ষিত আশ্রয়ে রাখলেন সাহেব।

'সাহেবের বয়েস চল্লিশের ওপর। মেমসাহেব হোমে। ন'মাসে ছ'মাসে মেমসাহেবের সঙ্গে সাহেবের যোগাযোগ হয়। সাহেবের শরীরে তাকতও যথেষ্ট। স্বভাবতই হীরাবালার আগুন সাহেবকে পোড়াতে শুরু করে। সাহেবের চোখে-মুখে আসক্তি ও কামনার ছাপ স্পষ্ট হয়ে ওঠে হীরাবালাকে দেখলেই। হীরাবালাও নিঃসাড়ে টের পান সাহেব তাঁর প্রতি ক্রমশ প্রেমাসক্ত ও অনুরাগী হয়ে উঠছেন। শেষ পর্যন্ত প্রবৃত্তির টানে দুজনেই সংযম হারান এবং নিয়মিত দৈহিক সঙ্গমে লিপ্ত হন।

'সাহেবের কোঠি-সংলগ্ন একটা ঘোড়াশালে হীরাবালা তখন তদারকি করেন। কাজের অবসরে যখন-তখন সাহেব লুকিয়ে মিলিত হতেন হীরাবালার সঙ্গে। অল্পদিনের মধ্যেই হীরাবালা গর্ভবতী হন। তখন থেকেই সাহেব একটু সতর্ক হলেন। হীরাবালার সঙ্গে মেলামেশার রাশ টানলেন কিছুটা। ব্রিটিশ সাহেবের ঔরসে একজন নেটিভ মেয়েমানুষ গর্ভবতী হয়েছে— এটা জানাজানি হলে লজ্জার একশেষ। সাহেব হঠাৎ কিছুদিনের জন্য ইংল্যান্ড চলে গেলেন।

'গর্ভবতী অবস্থাতেও হীরাবালা যথেষ্ট পরিশ্রম করতেন। এবং কখনই সঠিক আন্দাজ করতে পারেননি, কোন্ সময় তাঁর সন্তান ভূমিষ্ঠ হতে পারে। ঘোড়াশালে কর্মরত অবস্থাতেই একদিন তাঁর প্রসববেদনা ওঠে। অন্যান্য মহিলাদের তৎপরতায় সেই ঘোড়াশালেই আমার দাদুর জন্ম হয়। সকলেই জানল, মৃত রাজেন্দ্রর সন্তান আমার দাদু।

'ইংল্যান্ড থেকে ফিরে সাহেব সব শুনলেন এবং হীরাবালার সন্তানকে দেখলেন। নিজের সন্তানকে চিনতে তাঁর ভুল হয়নি। সন্তানের মায়ায় পড়ে গেলেন তিনি। কাগজ-পত্র ঘেঁটে রাজেন্দ্রর নামানুসারে ছেলের নাম রাখলেন অবনীশ। কিন্তু পদবী হল সিন্‌হা। অবনীশ সিন্‌হা। হীরাবালাকে গোপনে ডেকে জানিয়ে দিলেন, ছেলের সব দায়িত্ব তাঁর। হীরাবালা জানতেন, সাহেবের ছেলেকে তিনি পেটে ধরেছেন। অতএব সাহেবের মহানুভবতায় তিনি নিশ্চিন্ত ও খুশি হলেন।

'সাহেবের তত্ত্বাবধানে রাজকীয় প্রথায় ঘোড়াদের সান্নিধ্যে দাদু বড় হচ্ছিল। ইংরেজি ও বাংলা দুটো ভাষাতেই দাদুর সমান দখল ছিল। দাদুর অভিভাবক ও গুরু ছিলেন স্মিথ সাহেব। দশ-বারো বছর বয়সেই দাদু ঘোড়ার লাগাম ধরে। ট্রেনার ও জকিদের সঙ্গে থাকতে থাকতেই দাদুর প্রশিক্ষণ শুরু হয়। সব রকমের কলা-কৌশল দ্রুত আয়ত্ত করে দাদু। সতেরো আঠারো বছর বয়সেই দাদু একজন দক্ষ ঘোড়া-বিশারদ হিসেবে চিহ্নিত হয়ে যায়।

'তখন থেকেই দাদুর ওপর সব ভার দিয়ে সাহেব ধীরে ধীরে অবসর নিতে শুরু করেন। গোপনে উইল করেন সাহেব। তাঁর অবর্তমানে সমস্ত স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির মালিকানা দানপত্র হিসেবে লিখে দেন দাদুকে।

'সাহেব মারা যাবার পর হীরাবালা সমস্ত ঘটনা দাদুকে জানান। সমস্ত শুনে অগাধ সম্পত্তির অধিকারী দাদু মর্মবেদনায় মুষড়ে পড়ে। অনুশোচনায় ভগ্নবক্ষে সাহেবের সমাধিস্থলে বসে উপাসনা করে প্রতিদিন।

'কলকাতায় রেসের মরশুমে অবনীশ সিন্‌হা রেসিং ওয়ার্ল্ডে চূড়ান্ত সাফল্যের প্রতীক হিসেবে চিহ্নিত হয়ে যায়। সর্বত্রই আলোচনার মূল বিষয় এ. সিন্‌হা। নিজের হাতে ট্রেনিং দেওয়া ঘোড়ার পিঠে নিজেই জকি। এ. সিন্‌হার ধারে-কাছে ঘেঁষতে পারে না কেউ। এক বিরল দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করে প্রায় কিংবদন্তী নায়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয় দাদু। চেহারা, উপস্থিতি, আচরণ, কলা-কৌশলে দাদু তো আসলে ব্রিটিশ। তার আবির্ভাবেই একটা জ্যোতির্ময় পরিমণ্ডলের সৃষ্টি হয়। ক্রমশ দাদু সমস্ত ট্রেনার, জকি ও ঘোড়ার মালিকদের চক্ষুশূল হয়ে ওঠে। চারপাশে শত্রুর সংখ্যা বাড়তে থাকে।

'একবার রেসের দিন সকালে ক্যালকাটা রেস কোর্সে দাদু ঘোড়াকে স্পার্ট ও গ্যালপ করাচ্ছে। ফিরে আসার সময় দাদুর কানের পাশ দিয়ে তীক্ষ্ণ গতিতে একটা বুলেট ছুটে যায়। সঙ্গে সঙ্গে বসে পড়ে দাদু। চোখে পড়ে যায়, মাস্ক-পরা একটা লোক ঊর্ধ্বশ্বাসে গ্যালারির ওপর দিকে ছুটে অদৃশ্য হয়ে গেল। সেদিন রেসে নামল না দাদু। চারদিকে হৈ-চৈ পড়ে গেল। পরের দিন কাগজে বেরুল সেই খবর।

'সব শুনে হীরাবালা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন। সবেধন নীলমণি ওই ছেলে ছাড়া তাঁর কিছুই নেই। তিনি বেঁকে বসলেন। ঘোড়ার পাট তুলে দিতে হবে অবনীশকে। ছেলের যেখানে জীবন-সংশয়, কোনও ঝুঁকি নিতে তিনি রাজি নন। টাকাটা যেখানে কোনও সমস্যা নয়, ব্যবসায় নামতে ক্ষতি কি! তিনি ছেলের কাছে প্রতিশ্রুতি আদায় করেন—ঘোড়ার জগৎ থেকে তাকে বিদায় নিতেই হবে।

'সব ঘোড়া নিলামে তুলল দাদু। স্থাবর সম্পত্তি সব বেচে দিল। কাজের লোকজনকে মোটা টাকা দিয়ে বিদেয় করল। অঢেল টাকা নিয়ে ব্যবসায় নামল দাদু। ট্রান্সপোর্ট, অয়েল মিল, রাইস মিল, সুগার মিল, চা-বাগান—এইসব ব্যবসায় নেমে আরেক দিক দিয়ে সমাজের একজন কৃতি সিদ্ধপুরুষ হিসেবে জায়গা করে নেয় দাদু। আজ দাদুর সব সম্পত্তি আর ব্যবসার একমাত্র উত্তরাধিকারী আমি।'

সব শুনে নন্দিতা মন্তব্য করল, 'তাহলে ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে এই—এক : তোমার আসল নাম স্যার উইলিয়াম তড়িৎ স্মিথ, দুই : তোমার রক্তের সঙ্গেই ঘোড়ার সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য।'

আমি বললাম, 'তা বলতে পারো। তবে, দাদুর ডাইরি পড়ার আগে কোনওদিন রেসের মাঠ দেখিনি। ডাইরিটা পড়ার পর অনুভব করি, দুর্বার গতিতে রেসের মাঠ আমায় টানছে। তুমি ঠিকই বলেছ, রেস আমার রক্তেই ছিল।'

রাত অনেক হয়েছে। বোতলের পানীয় তলানিতে এসে ঠেকেছে। মাইক্রো ওভেনে কাবাব গরম করে পরিবেশন করল নন্দিতা। নিজেও নিল। খেতে খেতে জিজ্ঞেস করল, 'আধপেটা খেয়ে ঘুম হবে তো?'

দিশেহারা রাজেন্দ্র ঘোড়াটাকে আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করেন। ঘোড়াটা লাফিয়ে সজোরে একটা ঝটকা দিতেই...

আমি বললাম, 'কেন? চুমু খাওয়া বাকি আছে না? ওতেই পেট ভরে যাবে।'

ও বলল, 'তাই? আমার তো মনে হয়, তাতে খিদে আরও বেড়ে যাবে।'

আমি বললাম, 'এখন শুতে ইচ্ছে করছে না। চলো, মাঝরাতের নির্জন কলকাতাকে একটু সঙ্গ দিয়ে আসি।'

ও বলল, 'সেই ভালো। বাইরে বেরুলে ঘরটা আরও বেশি করে টানবে।'

সেই আশাতেই বেরিয়ে পড়লাম দুজনে।

বম্বে থেকে বুলু কলকাতায় এলেই আমার সবকিছু এলোমেলো হয়ে যায়। যখন-তখন অফিসে এসে হাজির হবে। তুলে নিয়ে কোথাও চলে যাবে। সিনেমার কোনও হিরোইনের সঙ্গে সন্ধ্যায় বসিয়ে দেবে মদের টেবিলে। তিন তাসের জুয়ায় মেতে গেলে রাত কাবার। হয়তো মাঝরাতে কোনও খ্যাতনামা সঙ্গীতশিল্পীকে ফোন করে বলে দিল, দাদা গান শুনতে আসছি। কখন যে কী করবে বোঝা যায় না। তবে, একথাও ঠিক, বুলু দাস অকারণে বম্বে থেকে কলকাতায় আসে না। বিশাল বৃত্তে ওর বিচরণ। কোনও না কোনও মতলব বা ধান্দা ছাড়া ও চলে না।

শ্রীমান আজ সন্ধ্যা ছটায় আমার সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করেছে। পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছে, তার একটাই দায়িত্ব, দয়া করে সে সশরীরে উপস্থিত হবে আমার অফিসে। এরপর সব দায়িত্ব আমার। তার দাবিও খুব বেশি নয়—চাই ভালো মদ এবং এক সুন্দরী নারীর সান্নিধ্য। ব্যাস্।

মাঝে ইভিনা মায়ের অসুস্থতার কারণে বসিরহাট গিয়েছিল। দুদিন পরে ফিরে ফোন করেছিল। ওর কাছে দশটা ফ্রি এনট্রি পাওনা আছে। অগ্রাধিকারও পাবো আশা করি। ফোন করলাম ওকে। ওর একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল আটটায়। আমার আগমনের সংবাদে সেটা বাতিল করে দিল। জানিয়ে দিলাম সাড়ে ছ'টা নাগাদ এক বন্ধুকে নিয়ে যাব। ও খুশি হয়ে জানাল, দামী মদ ওর কাছে আছে। হ্যাম স্যান্ডুইচ আর পমফ্রেট ভাজা খাওয়াবে। সঙ্গে কিছু আনার দরকার নেই। ফাইন!

ছটা দশে শ্রীমান দয়া করে আমার অফিসে বডি ফেললেন। সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়লাম। কালুকে ছুটি দিয়ে বেরিয়ে পড়লাম দুজনে। পথে যেতে যেতে জিজ্ঞেস করলাম, 'সত্যি করে বল্‌তো, কী মতলবে এবার এসেছিস। তোর ধান্দাটা কী?'

মিটিমিটি হেসে বুলু বলল, 'আছে, আছে। একটা বড় দাঁও মারার ধান্দা আছে। সব বলব তোকে। এবারে তোকে সঙ্গে নিয়েই একটা ফায়দা তোলার ইচ্ছে আছে।'

আমি বললাম, 'তুই নিজে তো একাই একশো। আবার আমাকে সঙ্গে নেবার কী দরকার!'

ও বলল, 'তোকে দরকার হবে। পরিকল্পনা, কন্‌ট্যাক্টস্, আয়োজন সব আমার। তুই শুধু টাকা ঢালবি। প্রফিট ফিফ্‌টি-ফিফ্‌টি। লাখ পাঁচেক পেলে মন্দ কি বল? তবে পুরো টাকা তোকে দিতে হবে না। থারটি পার্সেন্ট দিলেই চলবে। বাকিটা মাছের তেলে—বুঝলি না?'

আমি বললাম, 'তা বুঝলাম, কিন্তু প্ল্যানটা কি?'

বিজ্ঞের মতন ও বলল, 'বলব বন্ধু, সবই বলব। তা, এখন আমরা যাচ্ছি কোথায়, গুরু?'

আমি হেঁয়ালি করে বললাম, 'গেলেই বুঝতে পারবি।'

ইভিনা দরজা খুলতেই বুলুর চোখ গোলগোল হয়ে গেল। ভেতরে ঢুকে আমি ওদের পরিচয় করিয়ে দিলাম। মেয়েমানুষ দেখলে বুলু একটুও স্থির থাকতে পারে না। তার ওপর ইভিনার মতন মেয়েমানুষ! যেমন রূপের চটক, তেমন তার ঝলকানো যৌবনে যৌন আবেদন! বুলু বলল, 'যদি আপত্তি না থাকে তাহলে ইভিনাকে আগে একটু ছুঁয়ে দেখতে চাই। আসলে, ও সত্যি মানবী কিনা—'

আমি বললাম, 'ন্যাকামি করিস না,' ইভিনাকে বললাম, 'ওকে একটু ভেতরে নিয়ে যাও।'

বুলু বলল, 'না না, সে পরে হবে'খন। আগে একটু তৃষ্ণা মেটাই।—' বলেই ও ইভিনার বগলের তলা দিয়ে হাত ঢুকিয়ে দুহাতে ওকে বুকে চেপে ধরে একটা লম্বা চুম্বন করল।

আমি বললাম, 'ব্যাটা, আগের মদের তৃষ্ণাটা মেটা।'

ও ইভিনাকে ছেড়ে সোফায় বসল। কয়েক সেকেন্ডেই ও ইভিনাকে এলোমেলো করে দিয়েছে। ইভিনা নিজেকে সাব্যস্ত করে নিয়ে সেন্টার টেবিলে মদের সরঞ্জাম সাজিয়ে দিল। আমি স্কচের বোতল খুলে গ্লাসে গ্লাসে মদ ঢালছি। বুলু বলল, 'প্রথমেই মেয়েদের না-ছুঁলে কিছুতেই ছোঁক্‌ছোঁকানি যায় না। এখন বেশ ফ্রি লাগছে। মনে হচ্ছে, ইভিনা আমার অনেক দিনের চেনা।'

পান-পর্ব শুরু হল। আমি ইভিনাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'তোমার মা কেমন আছে?'

ইভিনা বলল, 'ভালো না। লিভার কিড্‌নি ড্যামেজ হয়েছে। দমদমে একটা নার্সিংহোমে রেখেছি মা-কে।'

বুলু বলল, 'সেকি! তোমার মা ড্রিংক করেন নাকি?'

ইভিনা বলল, 'অত্যাচার তো কম করেনি জীবনে, সয়েছেও প্রচুর। সতেরো আঠারো বছর সোনাগাছিতে ছিল। তারপর প্রায় বছর দশেক ভরসা ছিল রেসের মাঠ। এখন ভরসা আমি।'

বুলু বলল, 'গণিকা থেকে গ্যাম্বলার! ভেরি ইন্টারেস্টিং। আপত্তি না থাকলে শুনি।'

ইভিনা বলল, 'একটি মুসলিম যুবক মাকে ষোলো বছর বয়সে ফুঁসলে নিয়ে কলকাতায় চলে আসে। বলেছিল, বিয়ে করবে। কিন্তু বিয়ে না করেই একসঙ্গে বসবাস শুরু করে। খিদিরপুরের ঘন বসতি এলাকায় একটা ভাড়াবাড়িতে মাকে নিয়ে থাকত যুবকটি। সে ছিল ঘোড়ার জকি। খুবই এক্সপার্ট। রেস হলেই সে মাকে মাঠে নিয়ে যেত। গ্যালারিতে বসে মা রেস দেখত।

'মাস তিনেক পরে মা গর্ভবতী হয়। তখন বিয়ে করার জন্য মা যুবকটিকে চাপ দিতে থাকে। সেই সময় একটি রেসে কারচুপি করার জন্য যুবকটি সাসপেন্ড হয়ে যায়। এক বুকমেকারের কাছ থেকে টাকা খেয়ে ফেভারিট ঘোড়াকে টেনে দিয়েছিল। ফলে সেই ঘোড়া উইন তো পায়ই নি, প্লেসেও আসেনি। সাসপেন্ড হয়ে সেই যুবক মাকে ফেলে পালিয়ে যায়। রেসে

কারচুপি বা সাসপেন্ড হওয়ার ব্যাপারটা মা তখন জানত না। মা তার আশায় রেসের মাঠে গিয়ে বসে থাকত।

'রেসের মাঠে একজন মধ্যবয়সী পুরুষ মাকে নিয়মিত লক্ষ্য রাখত। সে সম্ভবত বুঝে গিয়েছিল, মা বেওয়ারিশ। মায়ের রূপ-যৌবনে আকৃষ্ট হয় সে। ছল্-চাতুরি করে সে মায়ের সঙ্গে ভাব জমায়। তার কাছেই মা জানতে পারে, যার আশায় মা এসে বসে থাকে, সে কী কারণে উধাও হয়েছে। মধ্যবয়সী লোকটি পুরো সুযোগ নিল। ভুলিয়ে ভালিয়ে সে মাকে তার বাড়িতে নিয়ে গেল। আসলে সে সোনাগাছিতে এক মাসির হাতে তুলে দেয় মাকে। তখনও মা জানতে পারেনি, নিষিদ্ধপল্লীতে আশ্রয় পেয়েছে মা। মাসি মাকে খুব তোয়াজে রাখে। মাসখানেক পরে মাকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে মাসি গর্ভপাত করায়। মাস দুয়েক পরে মাসির আসল রূপ ধরা পড়ে মায়ের কাছে।

'নিয়তি মাকে সোনাগাছিতে নিয়ে যায়। বছর দুয়েক পরে যখন মায়ের পাকাপাকি ঠিকানা সোনাগাছি, পা শিকলমুক্ত, তখন বাইরে বেরুবার ছাড়পত্র পেলো মা। রেসের মাঠ আবার মাকে ডেকে নিয়ে গেল। সেখানে মা তার পুরনো প্রেমিকের সন্ধান পেলো। সে জানত না, মায়ের তখন কী হাল! সব শুনে সে মা-কে গ্রহণ করতে চাইল। কিন্তু মা তাতে রাজি হয়নি। মা তার দেওয়া টিপ্‌স্-এ ঘোড়ায় বাজি ধরত। বেশির ভাগ বাজি মা জিতত। রেসের মাঠ থেকে পছন্দমতো পুরুষকে মা তার ডেরায় নিয়ে যেত।

'মা-র সহবাসিনীরা রেসের গল্প শুনে উৎসাহিত হত। ক্রমে ক্রমে কেউ কেউ মায়ের সঙ্গে আসতে শুরু করে। এক সময় দশ-বারো জনের একটি দল মাঠে নিয়মিত আসতে শুরু করল। রেসুড়েরা এই দলটিকে চিনত। অনেকেই এই দলটির সঙ্গে ফস্টি-নস্টি হাসি মস্করা করত।

'এই সময় এক বড়লোক ভ্যাগাবন্ডের সঙ্গে মা-র ঘনিষ্ঠতা হয়। সে উল্টোপাল্টা রেস খেলে টাকা নষ্ট করত। পঁচিশ-ছাব্বিশ বছরের এই যুবক অতি মাত্রায় সুপুরুষ ও সুদর্শন ছিল। সে ছিল দিলখোলা, উদার ও বিত্তবান। তার ঝাঁকড়া চুল আর নীল চোখ দেখে মা পাগল হয়।

'এই সময় তিন মাসের জন্য মা-র ঠিকানা বদলে যায়। মা তার এই ঘনিষ্ঠ পুরুষটির সঙ্গে তিন মাস কাটায় ভূস্বর্গে। এই তিনমাস মা অবাধে স্বাধীন সঙ্গমে রত হয়। স্বেচ্ছায়। দ্বিতীয়বারের জন্য গর্ভবতী হয় মা।

'যথাসময়ে আমার জন্ম হল।

'পনেরো বছর বয়েস পর্যন্ত আমার ঠিকানা ছিল উটি। সেখানে একটা মিশনারি আশ্রমে আমি বড় হই। আমার বাবা নিয়মিত মোটা টাকা পাঠাত সেখানে। আমি আমার বাবাকে কোনওদিন দেখিনি। মা বলত, আয়নার সামনে দাঁড়ালেই বাবাকে দেখতে পাবি। আমি নাকি হুবহু বাবার ছাঁচে গড়া।

'বছর বিয়াল্লিশ বয়সে লিভার ক্যান্সারে বাবা মারা যায়। বাবার কোনও বৈধ বিবাহ ছিল না। ফলে, বাবার বিষয়-সম্পত্তি অন্যান্য দাদা-ভাইদের মধ্যে ভাগ হয়ে যায়। উটিতে টাকা পাঠানোও বন্ধ হয়ে যায়।

'মা জানত, আমার ভবিষ্যৎ কী। গণিকার মেয়ে গণিকাই হয়। বংশানুক্রমে এই ধারা প্রবহমান। এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এটা জেনেশুনেই গণিকারা মা হয়। কেননা, যৌবন বিদায় নিলে তখন মেয়ের ওপরেই ভরসা করতে হয়। অতএব আমার ভবিষ্যৎ মা ঠিক করেই রেখেছিল।

'বাবা মারা যাবার পরে মা উটিতে এলো আমাকে নিতে। পথে ফিরতে ফিরতেই আমার প্রাথমিক মগজ-ধোলাই করে দিল মা। সোনাগাছিতে আমাকে তোলেনি মা। গ্লোব সিনেমার পাশে একটা গলিতে 'পূর্ণিমাদি'-র ফ্ল্যাটে মা তুলে দিল আমায়। পূর্ণিমাদির সঙ্গে সম্ভবত মায়ের কথাবার্তা আগেই পাকাপাকি হয়ে গিয়েছিল।

'পূর্ণিমাদির ফ্ল্যাটটা আসলে হাফগেরস্তদের সাময়িক প্রাইভেট ডেরা। এখানে মেয়েদের রাস্তায় দাঁড়াতে হয় না। গৃহস্থ যুবতী মেয়ে ও বধূরা বেলা বারোটা থেকে সন্ধ্যা ছ'টা পর্যন্ত এখানে অবস্থান করে। সংখ্যায় খুব বেশি হলে দশ। ফ্ল্যাটের দরজা একটা করিডরে। করিডর সংলগ্ন দুটি ঘর। একটি ঘরে মেয়েদের বসবার জন্য সোফাসেটের ব্যবস্থা। অন্য ঘরটি কাঠের পার্টিশন দিয়ে দু-ভাগ করা। প্রত্যেকটি ভাগে খাট-বিছানা—শোবার ব্যবস্থা। ঘরের বাইরে টানা বারান্দার শেষ প্রান্তে একটি বাথরুম।

'এখানে যারা 'কাস্টমার' তাদের অবশ্যই পূর্ণিমাদের চেনা-জানা পরিচিত হতে হবে। অথবা, নতুন যারা আসবে, তাদের অবশ্যই পূর্ণিমাদের পূর্ব পরিচিতদের সঙ্গে প্রথমে আসতে হবে। ডোরবেল বাজলে পিপহোলে চোখ রেখে পূর্ণিমাদি দেখে নেয়, তারপর দরজা খোলে। আগন্তুককে সঙ্গে করে পূর্ণিমাদি মেয়েদের ঘরে নিয়ে আসে। অপেক্ষমান মেয়েদের মধ্যে আগন্তুক কাউকে পছন্দ করে এবং পাশের ঘরে নিয়ে যায়। রতিক্রিয়া সেরে ফিরে যাবার আগে আগন্তুক পূর্ণিমাদিকে দক্ষিণা দিয়ে যায়। তা থেকে পূর্ণিমাদি নিজের কমিশন কেটে মেয়েদের পেমেন্ট করে।

'পূর্ণিমাদির কাছে আমাকে বেশিদিন থাকতে হয়নি। আমার বয়েস, রূপ-যৌবনের জন্য অন্য মেয়েরা আমাকে প্রথম থেকেই ঈর্ষা করতে শুরু করে। আমার জন্য তাদের 'কাস্টমার' জুটতে চায় না। সকলেই আমাকে পেতে চায়। ক্রমান্বয়ে একটার পর একটা পুরুষকে সঙ্গ দিয়ে যাওয়া একজন মেয়ের পক্ষে সম্ভবও নয়। অন্যান্য মেয়েদের থেকে আমার রেট ছিল চারগুণ। তা সত্ত্বেও আগন্তুকরা আমার জন্যে অপেক্ষা করে থাকত। আরও একটা ব্যাপার ছিল। সব মেয়েরা আসত বাইরে থেকে। আমি পূর্ণিমাদির সঙ্গে থেকে যেতাম। ফলে, পূর্ণিমাদি কোনও কোনও আগন্তুকের সঙ্গে সাট করে সারা রাতের জন্য আমার ঘরে ঢুকিয়ে দিত। সারারাত মদ্যপান, স্তনমর্দন আর আসুরিক ধর্ষণ সইতে হত আমাকে।

'একজন আগন্তুক, নাম রাজেশ গোলানি, সপ্তাহে তিনদিন আমার জন্য আসত। সে আমাকে পূর্ণিমাদির ডেরা থেকে সরাতে চাইল। বলল, আমাকে আলাদা জায়গায় রাখার ব্যবস্থা করবে। একান্তভাবে তার নিজস্ব রানী করে রাখবে আমাকে। আমাকে আগাম এক লক্ষ টাকা দেবার প্রতিশ্রুতি দেয় সে। ভয় পেয়ে প্রথমে আমি রাজি হইনি। পরে ভেবে দেখলাম, প্রাণ ছাড়া আমার হারাবার কিছুই নেই। রাজেশ গোলানি আমাকে ভালোবেসেছিল। বিশ্বাস ছিল, সে আমাকে প্রাণে মারবে না। আমি সরাসরি পূর্ণিমাদিকে রাজেশের প্রস্তাবের কথা বলি। পূর্ণিমাদি বলল, রাজেশের সঙ্গে কথা বলবে। মোটা টাকা দাঁও মেরে পূর্ণিমাদি আমাকে রাজেশের সঙ্গে ছেড়ে দেয়।

'রাজেশ আমাকে মহারানীর মতোই রেখেছিল। এক লক্ষ নয়, আমাকে পাঁচ লক্ষ টাকা দিয়েছিল রাজেশ। দুবছর পরে রাজেশ উধাও হয়ে যায়। তার অন্তর্ধান-রহস্য আজও আমার কাছে অজ্ঞাত।'

কথা শুনতে শুনতে বুলু টপাটপ চালিয়ে যাচ্ছে। ইভিনা থামতে ও জিজ্ঞেস করল, 'তোমার মায়ের রেসের মাঠে আসার ব্যাপারটা শুনতে চাই।'

ইভিনা বলল, 'বড্ড বেশি নিজের কথা বলে ফেলছি। এবার আসছি সে-প্রসঙ্গে।'

আমি বললাম, 'এতদিন তোমার কাছে আসছি, অথচ কোনওদিন তোমার বা তোমার মায়ের অতীত নিয়ে কথা হয়নি। আজ সব শুনে কেমন যেন বিষণ্ণ বোধ করছি। গোটা ব্যাপারটা বড়ই বেদনার। এসব কথা শুনলে ভোগের চেয়ে প্রেমের অনুভূতি জাগে বেশি।'

ইভিনা বলল, 'কেউ তো এসব শুনতে চায় না। সময় কোথায়! এখন থেকে তুমি আমাকে একটু বেশি করে ভালোবেসো। তোমার সঙ্গে লেনদেনের পাট আর রাখব না।'

উঠতে উঠতে ও আবার বলল, 'তোমরা চালিয়ে যাও, আমি তোমাদের জন্যে হ্যাম স্যান্ডুইচ আর মাছভাজা নিয়ে আসছি।'

ইভিনা উঠে যেতে বুলু বলল, 'আমি যদি আজ রাতে ওর সঙ্গে থেকে যাই, তোর আপত্তি আছে?'

আমি বললাম, 'আমার আপত্তি কিসের! তোর ইচ্ছে হলে থাকবি।'

বুলু বলল, 'ওই নীল চোখ আর সেক্সি ফিগার আমাকে ভীষণ টানছে। নেশা ধরিয়ে দিয়েছে মেয়েটা।'

আমি বললাম, 'থেকে যা। তবে, নেশা বাড়বে বৈ কমবে না। ওর সঙ্গে শুলে তোর নতুন অভিজ্ঞতা হবে।'

গ্লাসে হুইস্কি ঢালতে ঢালতে জিজ্ঞেস করলাম, 'তোর ধান্দার কথাটা বল।'

ও বলল, 'কলকাতায় বম্বের ফিল্মস্টার আর আর্টিস্টদের নিয়ে একটা 'নাইট' করব ভাবছি। অবশ্য কলকাতার প্রথম সারির কয়েকজন স্টার আর শিল্পীও নেওয়া যেতে পারে। মোটামুটি একটা তালিকা তৈরি করেছি।

অংশগ্রহণকারী শিল্পীদের ফিফ্‌টি পার্সেন্ট অ্যাডভান্স, প্লেনের টিকিট, বিজ্ঞাপন, স্টেডিয়াম আর হোটেল ভাড়া নিয়ে লাখ পাঁচেক লাগবে। রেস্ট ফিফ্‌টি পার্সেন্ট দিনের দিন দিলেই চলবে। টিকিটের টাকা থেকেই সেটা দেওয়া হবে। মোটামুটি একটা হিসেব করে দেখেছি, ফেলে-ছড়িয়ে পাঁচ লাখ টাকা লাভ হবেই।'

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'আমাকে কত টাকা দিতে হবে?'

বুলু একটু চিন্তা করে বলল, 'বিজ্ঞাপনটা এজেন্সির থ্রু দিয়ে করব। ওটা ধারে হয়ে যাবে। হোটেল বুক করতে অ্যাডভান্স লাগবে। স্টেডিয়াম আর ডেকরেটরের জন্যেও অ্যাডভান্স দেব। তা ধর, লাখ তিনেক তোকে দিতে হবে। কিছু হোর্ডিং নিতে হবে, ব্যাপক পোস্টারিং করতে হবে। আরও হাজার পঞ্চাশেক টাকা রেডি রাখবি—চাওয়া মাত্র যাতে পাই।'

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'কোথায় করবি ভেবেছিস?'

ও বলল, 'ভাবছি রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়ামটা নেব। সিকিউরিটির ব্যবস্থা জোরদার করতে হবে। কাল থেকেই যোগাযোগ শুরু করব। ডেট কনফার্মড হলেই বম্বে ফিরে এগ্রিমেন্টগুলো করে ফেলব ঝটাপট। তারপরেই কলকাতায় এসে নামব জোরকদমে।'

ইভিনা ফিরে এলো। হাতে প্লেট। প্লেট থেকে ধোঁয়া উঠছে। খাদ্যের সুঘ্রাণ আগে থেকেই পাওয়া যাচ্ছিল। ও প্লেট নামিয়ে বলল, 'স্যান্ডুইচ না করে হ্যাম ওমলেট করলাম, সঙ্গে পমফ্রেট ভাজা। তোমরা গরম গরম শুরু করো।'

বুলু বলল, 'এখন আমার সব ক্ষুধা তোমাকে কেন্দ্র করে। রাতে ফিরছি না কিন্তু।'

ইভিনা আমার দিকে তাকালো। চোখে জিজ্ঞাসা।

আমি বললাম, 'হ্যাঁ, বুলুর আর তর সইছে না। তোমাকে আজ সারা রাত জ্বালাবে।'

বসতে বসতে ইভিনা একটা কটাক্ষ হানল বুলুকে। আমাকে বলল, 'তোমার বন্ধুর বায়নাক্কা সামলাতে রাজি হতে পারি একটি শর্তে।'

আমি বললাম, 'বলো।'

ইভিনা বলল, 'প্রথমে তোমরা দুজন একসঙ্গে আমার সঙ্গে শোবে। আমরা তিনজন এক বিছানায় সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে ত্রি-সঙ্গমে লিপ্ত হব। রাজি?'

আমি বললাম, 'হঠাৎ এমন উদ্ভট শর্ত দিচ্ছ কেন?'

ইভিনা বলল, 'বুলু আজ প্রথম এসেছে তোমার সঙ্গে। তোমাকে বাদ দিয়ে একা বুলুকে নিয়ে থাকি কী করে!'

আমি বললাম, 'ত্রি-সঙ্গম-এর বদলে যুগলে আপত্তি কিসের?'

ইভিনা বলল, 'তোমাদের বন্ধুত্ব কতটা ঘনিষ্ঠ সেটা পরখ করব বলে।'

আমি বললাম, 'আচ্ছা, আগে তোমার মায়ের প্রসঙ্গটা শেষ করো।'

শুরু করল ইভিনা, 'আমি যখন পুরোদস্তুর রোজগেরে তখন মা-র সঙ্গে একদিন রেসের মাঠে হাজির হলাম। মা-র একজন বাবু আমাদের মেম্বার্স গ্যালারিতে এনে বসালো। কয়েকশো চোখ আমাকে হাঁ করে গিলছে। টার্ফ নিউজ দেখে মা তখন ঘোড়া বাছাই করছে। যথাসময়ে প্যাডকে ঘোড়া প্রদর্শিত হল। মা টোটে টিকিট কেটে আনল। রেস শুরু হল। শুরু হল মায়ের উত্তেজনাও। রেস শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মায়ের সে কী উল্লাস আর চঞ্চলতা! শুনলাম, মা একশো কুড়ি টাকা খেলে ছশো চল্লিশ টাকা পাবে। অর্থাৎ পাঁচশো কুড়ি টাকা নীট লাভ।

'সেদিন মায়ের সঙ্গে সবকটা রেস দেখলাম। আর আমাকে দেখলো কয়েকশো পুরুষ। তাদের চোখের ভাষা আমার অজানা নয়। বিত্তবান লালায়িত পুরুষ পাকড়ানোর যোগ্য স্থান এই রেসকোর্স। সুযোগটা কাজে লাগাই আমি। কিন্তু মায়ের রক্তে রেসের নেশা। আমার বয়েস যখন সতেরো, তখন থেকে মা একজন ট্রেনারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়। আর তখন থেকেই সোনাগাছির ঠিকানা মা পাল্টে নেয়। প্রায় ষাট বছর বয়স্ক এক সমর্থ পুরুষের রক্ষিতা তখন মা। শাঁসালো পুরুষ। রিপন স্ট্রীটের একটা ফ্ল্যাটে মায়ের বাস। রিপন স্ট্রীটের সেই ফ্ল্যাটে ট্রেনারটি মায়ের সঙ্গে গোপনে মিলিত হত। বিনা পয়সায় সে মাকে উপভোগ করত। বিনিময়ে মাকে রেসের টিপ্‌স্ দিত। যার আশি ভাগ শিওর এবং মা সেই টিপ্‌স্ অনুযায়ী বাজি লাগাত এবং সফল হত। শেষের দিকে রেস এবং মদ মায়ের রক্তের সঙ্গে মিশে যায়।'

বুলু বলল, 'মোদ্দা কথা, রেসের মাঠ থেকে তোমার মা-র রোজগার ভালোই হত এবং পতিতাবৃত্তি থেকে তোমার মা সরে আসে, অন্তত নির্ভরশীল ছিল না বলা যায়।'

ইভিনা বলল, 'ঠিক তা-ই।'

বুলু বলল, 'এই মুহূর্তে একজন হতভাগ্য মানুষের কথা আমার মনে পড়ে গেল। বম্বেতে স্টেট ব্যাঙ্কের একটা ব্রাঞ্চে ভদ্রলোক ব্রাঞ্চ ম্যানেজার। গত বছর ডিসেম্বরের ঘটনা। ব্যক্তিগতভাবে আমি চিনতাম ভদ্রলোকটিকে। পাক্কা রেসুড়ে ছিল। বম্বে ছাড়াও ইন্টার স্টেট বেটিং-এ রেগুলার খেলত। রোজগার খারাপ ছিল না। ভদ্রলোক নিঃসন্তান ছিলেন। কিন্তু রেসের মাঠ ভদ্রলোককে শুষে ছিবড়ে করে ফেলেছিল। বাধ্য হয়ে তখন ব্যাঙ্কের ভল্টে হাত পড়ে। প্রায় লাখখানেক টাকা সরে যায় সেখান থেকে। এদিকে ইয়ার এন্ডিং এগিয়ে আসছে। বছরের শেষ দিনের মধ্যে টাকা ভরতে না পারলে হাতকড়া থেকে পরিত্রাণ নেই।

'বম্বের প্রত্যেকটা রেসে আমি নিয়মিত যেতাম। ভদ্রলোক তার দুরবস্থার কথা আমাকে জানিয়েছিলেন। কীভাবে এই বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়া যায়, তা নিয়ে আমরা দুজনেই চিন্তিত হয়ে পড়ি। অবশেষে আমার এক বন্ধু মারফৎ এক বুকমেকারের সঙ্গে যোগাযোগ করি। সমস্ত ঘটনা তাদের কাছে খুলে বললাম। তারা সব শুনে তিনদিন পরে দেখা করতে বলল। তিনদিন পরে ভদ্রলোককে নিয়ে আবার গেলাম সেখানে। তারা বলল, ডিসেম্বরের শেষ রবিবার পাঁচ নম্বর রেসে একটা আপসেট হবে। সেই রেসে দু নম্বর ঘোড়া 'লাকি স্টার' এবং পাঁচ নম্বর ঘোড়া 'সিটি রয়্যাল' ফেভারিট। চল্লিশ থেকে আশি পয়সা দর থাকবে এই দুটো ঘোড়ার ওপর। কিন্তু বড় রকমের গট-আপ হবে এই রেসে। 'লাকি স্টার' এবং 'সিটি রয়্যাল'-এর জকিরা দুজনকেই টেনে দেবে ডিসট্যান্ট পোস্ট থেকে। জিতবে আট নম্বর ঘোড়া 'প্রিন্স আরডেন্ট' কমপক্ষে পনেরোর দরে। এক লক্ষ টাকা লাগালে পনেরো লক্ষ মিলবে। ভদ্রলোক ঠিক করলেন, আরও দু লক্ষ টাকা সরাবেন ভল্ট থেকে। দু লাখই লাগিয়ে দেবেন 'প্রিন্স আরডেন্ট'-এ। হিসেব কষে দেখা গেল—ট্যাক্স, বুকমেকারের কমিশন এবং ব্যাঙ্কের

তিন লাখ টাকা শোধ করেও প্রচুর টাকা হাতে থেকে যাবে। অতএব সেইমতো পরিকল্পনা হয়ে গেল।

'নির্দিষ্ট দিনে আমিও 'প্রিন্স আরডেন্ট'-এ হাজার টাকার উইন খেলে দিলাম। 'লাকি স্টার' এবং 'সিটি রয়্যাল'-এ পুল হয়েছে প্রায় কোটি টাকা। 'প্রিন্স আরডেন্ট'-এর দর বেড়ে হয়েছে কুড়ি। অর্থাৎ, বুকমেকারের কথা যদি সঠিক হয় তাহলে আমি পাবো কুড়ি হাজার, ভদ্রলোক পাবেন চল্লিশ লক্ষ। যথাসময়ে রেস শুরু হল। উত্তেজনায় ভেঙে পড়েছে মাঠ। ন'টা ঘোড়া চোদ্দশো মিটার নিঃশেষ করতে ছুটে আসছে ঊর্ধ্বশ্বাসে। প্রথম চারের মধ্যে 'প্রিন্স আরডেন্ট' নেই। ভদ্রলোকের সমস্ত রক্ত তখন চোখে। ফার্স্ট বেন্ড ঘুরতেই প্রথম চারের মধ্যে 'লাকি স্টার' ও 'সিটি রয়্যাল' ঢুকে পড়েছে। 'প্রিন্স আরডেন্ট' তখন পাঁচ নম্বরে। সেকেন্ড বেন্ড ঘুরতেই 'লাকি স্টার', 'সিটি রয়্যাল', 'প্রিন্স আরডেন্ট' আর 'ডানহিল স্টার' বাকি পাঁচটা ঘোড়াকে টপকে ছ-সাত লেংথ এগিয়ে। উল্লাস আর চিৎকারে ফেটে পড়ছে গ্যালারি। ডিসট্যান্ট পোস্টের আগেই 'প্রিন্স আরডেন্ট' পজিশন নিতে শুরু করল। পোস্ট পেরিয়েই 'প্রিন্স আরডেন্ট' এগিয়ে আসছে। 'লাকি স্টার', 'সিটি রয়্যাল' পিছিয়ে পড়ছে। প্রায় হেড-টু-হেড এগিয়ে আসছে 'প্রিন্স আরডেন্ট' আর 'ডানহিল স্টার'। উইনিং পোস্ট পেরিয়ে গেল 'প্রিন্স আরডেন্ট' আর 'ডানহিল স্টার'। মুহূর্তে চুপ্‌সে গেল সারা মাঠ। 'প্রিন্স আরডেন্ট' জিতেছে। কিন্তু প্রথম ও দ্বিতীয় স্থানে 'P' পড়ে গেল। অর্থাৎ ফটো ফিনিশে সিদ্ধান্ত হবে।

'টেনশন কোন্ পর্যায়ে পৌঁছতে পারে, তা ভদ্রলোককে না দেখলে বোঝা যাবে না। সারা মাঠে কারো মাথাব্যথা নেই। দুটো আপসেট ঘোড়ার মধ্যে কে জিতেছে তা নিয়ে ভাবতে লোকের বয়েই গেছে। 'লাকি স্টার' আর 'সিটি রয়্যাল'-এর দুই জকির মুণ্ডপাত হচ্ছে তখন। আরেক জনের ভাগ্য তখন বাঁচা-মরার মধ্যরেখায় ঝুলছে।

'জানা গেল, ক্যামেরা ফেল করেছে। স্টুয়ার্ডের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে ঘোষিত হবে। আলোচনা চলছে। পাঁচ মিনিট পরে 'ডানহিল স্টার'কে উইন ডিক্লেয়ার করল স্টুয়ার্ড। 'প্রিন্স আরডেন্ট' সেকেন্ড। যারা তীক্ষ্ণ

দৃষ্টিতে রেস দেখেছে, তাদের মতে অবশ্য 'প্রিন্স আরডেন্ট'ই জিতেছে। এক্ষেত্রে স্টুয়ার্ড কোনও বিশেষ স্বার্থে যদি পক্ষপাতিত্ব করে থাকে তাহলেও কিছু বলার নেই। মোট কথা, মাঠে এ-ব্যাপারে এতটুকুও তাপ-উত্তাপ ছিল না।

'ভদ্রলোককে খুঁজে পেলাম না। তিন লাখ টাকার ঋণ মাথার ওপর খাঁড়ার মতন ঝুলছে।

'পরের দিন সস্ত্রীক ভদ্রলোককে পাওয়া গেল সমুদ্রবেলায় মৃত অবস্থায়। স্বামী-স্ত্রী একসঙ্গে সমুদ্রে বিসর্জন দিয়েছেন নিজেদের।'

ইভিনা মন্তব্য করল, 'খুবই দুর্ভাগ্যজনক।'

বুলু বলল, 'এবার আমাদের দৌড় শুরু করা যাক। ইভিনা, তোমার ট্র্যাক প্রস্তুত?'

ইভিনা জবাব দেবার আগেই আমি উঠে পড়লাম। ওরা দুজনেই জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে আমাকে নিরীক্ষণ করল। ইভিনা জিজ্ঞেস করল, 'কোথায় যাচ্ছ?'

আমি বললাম, 'এবার যেতে হবে।'

বুলু বলল, 'সেকি! ইভিনার ট্র্যাকে—'

'ট্র্যাকে না, তুই ইভিনার জকি হ', ওর কথা কেড়ে নিয়ে আমি বলি, 'জোড়া মেয়েমানুষ নিয়ে শুই—একটা ঘোড়ার পিঠে দুটো জকি! ও আমার দ্বারা হবে না, ভাই।'

ইভিনা কিছু বলতে যাচ্ছিল। আমি বাধা দিয়ে বললাম, 'প্লিজ, আজ বুলুকে নিয়ে থাকো। আজ ভোগ নয়, প্রেমের অনুভূতি নিয়ে আমাকে ফিরতে দাও।'

কলকাতার সব যোগাযোগ সেরে বুলু বম্বে ফিরে গেল। রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়াম বুক করা হয়ে গেছে। কলকাতার প্রথম শ্রেণীর ফিল্মস্টার ও সঙ্গীতশিল্পীদের সঙ্গে প্রাথমিক কথাবার্তা সেরে গিয়েছে বুলু। এক সপ্তাহ পরে ও কলকাতায় এলে বিজ্ঞাপন রিলিজ করা হবে। অ্যাড্ এজেন্সির সঙ্গেও একটা চুক্তি হয়ে গেছে। কোন্ কোন্ পয়েন্টে হোর্ডিং বুক করা হবে, কত পোস্টার ছাপা হবে—সব ঠিক হয়েছে এজেন্সির সঙ্গে।

হাতে মাসখানেকের মতন সময় আছে। আমি বুলুকে তিন লাখ টাকা দিয়ে দিয়েছি। দায়-দায়িত্ব কিছুই আমার নয়। পর্দার আড়াল থেকে শুধু টাকা জোগানো আমার কাজ। চুক্তি যা কিছু হয়েছে বা হচ্ছে—সবই বুলু দাসের সঙ্গে। কলকাতায় এক ডেকরেটরের সঙ্গেও চুক্তি করে গেছে বুলু। সরকারি এবং বেসরকারি নিরাপত্তার ব্যাপারেও কথা হয়ে গেছে।

মাঝখানে নন্দিতা কিছুদিন কলকাতায় ছিল না। বম্বে গিয়েছিল। সেখান থেকে ব্যাঙ্গালোর হয়ে কলকাতা আসার কথা। সাধারণত কলকাতা ফিরেই ও আমাকে একবার ফোন করে। নানা ঝামেলায় আমিও ব্যস্ত ছিলাম কিছুদিন। ওর একটা খবর নেওয়া উচিত ছিল। ইদানিং অবচেতনে মন ওকে টানে। যেদিন মাঝরাতে ওকে নিয়ে নির্জন কলকাতায় চক্কর কাটি, সেদিন ফিরে এসে আমরা পরস্পর পরস্পরের কাছে সব কিছু বিলিয়ে দিই। বাকি রাতটুকু আমরা নগ্ন হয়ে উভয়ে উভয়ের উত্তাপ বিনিময় করি। শরীর এবং মন তা-ই চেয়েছিল। ভালোবাসার বন্ধনে ও আমাকে বন্দী করেছে।

আলিপুরে একটা ফোন করলাম। একজন মহিলা ফোন ধরলেন। নন্দিতার কথা জিজ্ঞেস করতে জানালেন, সপ্তাহখানেক পরে ও কলকাতায় আসবে। ব্যাঙ্গালোরে একটু ব্যস্ত আছে। এতো পরিষ্কার বাংলা শুনে সন্দেহ হল, ভদ্রমহিলা নন্দিতার মা নয়তো! ওর মা সুজাতা ওরফে রানীমার ব্যাপারে আমার যথেষ্ট কৌতূহল ছিল। আমি খুব ব্যাকুল হয়ে জিজ্ঞেস করে ফেললাম, 'আচ্ছা, আমি কি ওর মা সুজাতা দেবীর সঙ্গে কথা বলছি?'

ভদ্রমহিলা বললেন, 'আপনার অনুমান ঠিক। আমি সুজাতা। আমার মনে হচ্ছে, আপনি বোধহয় ওর বন্ধু তড়িৎ স্মিথ্। তাই না?'

আমি 'স্মিথ' শুনে কিঞ্চিৎ অবাক হলেও মুহূর্তে বুঝে নিলাম, নন্দিতা আমার সম্পর্কে ওর মাকে সব কথাই বলেছে। আমি বললাম, 'ঠিক তাই। আপনার মেয়ে দেখছি কিছু বলতে বাকি রাখেনি, রানীমা!'

আমার মুখ থেকে 'রানীমা' শুনে উনি বললেন, 'তড়িৎ স্মিথ্‌কে আমার দেখার খুব ইচ্ছে, রানীমা সম্পর্কে তার কি কোনও আগ্রহ আছে?'

আমি বললাম, 'আগ্রহ এবং কৌতূহল দুটোই তীব্র। এতোই তীব্র যে,

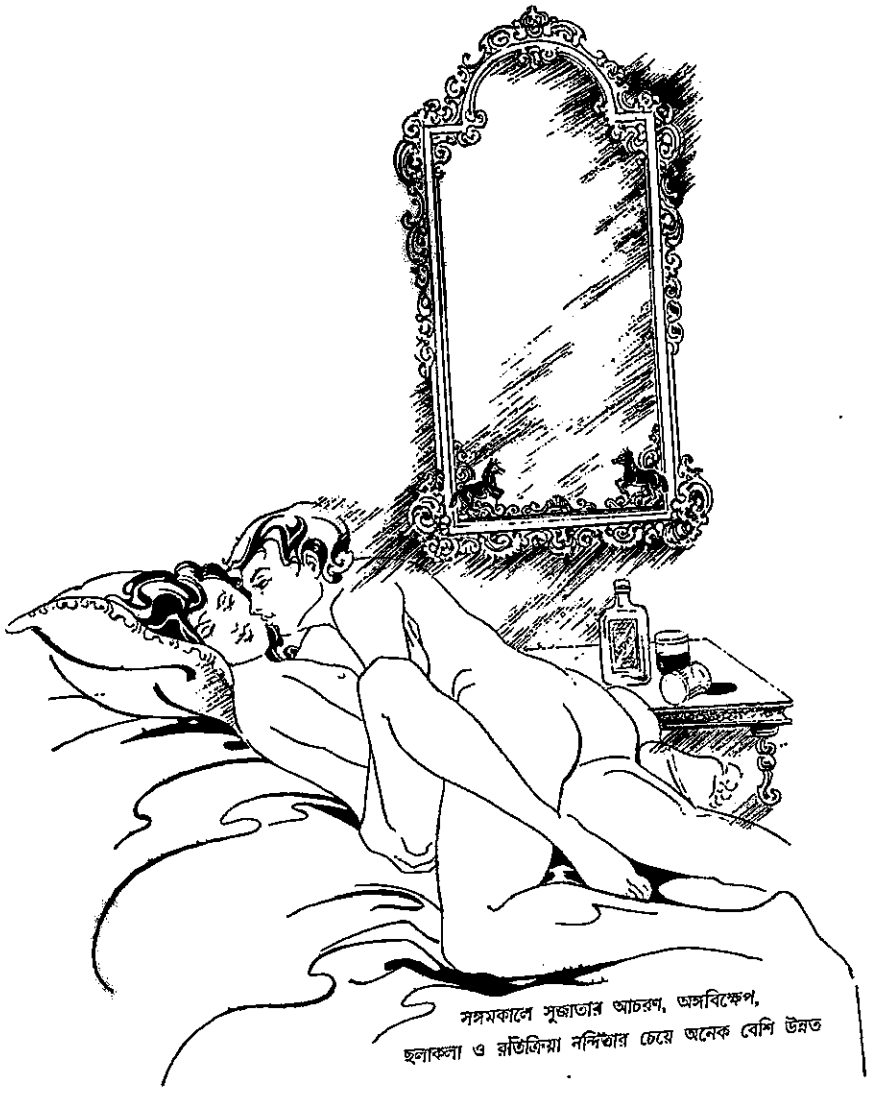

সঙ্গমকালে সুজাতার আচরণ, অঙ্গবিক্ষেপ, ছলাকলা ও রতিক্রিয়া নন্দিতার চেয়ে অনেক বেশি উন্নত

এই মুহূর্তে সে রানীমার প্রতি এক অপ্রতিরোধ্য টান অনুভব করছে। যদি অনুমতি দেন—'

'অনুমতি কেন?' সুজাতার স্বরে মৃদু অভিযোগ, 'আমিও তো তাকে দেখতে চেয়েছি। এটা পরস্পরের কাছে দাবি হবে না কেন! যাই হোক! কখন দেখা হচ্ছে?'

আমি বললাম, 'সন্ধ্যা সাতটা নাগাদ গেলে আপনার অসুবিধা হবে না তো?'

সুজাতা বললেন, 'না। আমি অপেক্ষায় থাকব।'

ক্ষণকালীন বিদায় বিনিময়ের পর লাইন বিচ্ছিন্ন হল।

নির্দিষ্ট সময়ে আলিপুরের প্রাসাদে পৌঁছে গেলাম। লৌহ-তোরণে ডিউটি-রত উর্দি-পরা পাঞ্জাবি দ্বাররক্ষী কোনও প্রশ্ন না করে গেট খুলে দিল। তাকে সম্ভবত পূর্বেই নির্দেশ দেওয়া ছিল। গাড়ি চালিয়ে ভেতরে ঢুকে গেলাম। প্রাসাদের পোর্টিকোয় গাড়ি রেখে নামতেই একজন সুন্দরী সুবেশা এগিয়ে এলেন। 'আপনি নিশ্চয়ই মিস্টার স্মিথ্?'

আমি বললাম, 'হ্যাঁ।'

'আসুন আমার সঙ্গে।' বলে ভদ্রমহিলা পিছন ফিরলেন। আমি ওঁকে অনুসরণ করলাম। মাঝখানে কার্পেট পাতা বিশাল ড্রইংরুমের সোফায় আমাকে বসিয়ে ভদ্রমহিলা মিষ্টি হেসে বললেন, 'একটু অপেক্ষা করুন।'

ড্রইংরুমের দুদিক থেকে গোলাকৃতি সিঁড়ি দোতলায় মিলিত হয়েছে। আমার সামনের দেয়ালে লাইফ সাইজের একটা ছুটন্ত ঘোড়ার ছবি। কালো স্বাস্থ্যবান ঘোড়া। ইটালিয়ান মার্বেলের মেঝের রঙ হাল্কা সবুজ। দুদিক থেকে উঠে সিঁড়ি যেখানে মিলিত হয়েছে, তার নিচে একটা বড় দরজা। দরজায় মোটা ভেলভেটের পর্দা ঝুলছে। চারপাশ এতো নির্জন, মনে হয় বাড়িতে কোনও মানুষজন নেই।

কিছুক্ষণ পরেই ভেলভেটের পর্দা সরিয়ে যিনি আবির্ভূত হলেন, প্রথম দর্শনেই তাঁকে নন্দিতার যমজ বোন বলে ভুল হয়। ভদ্রমহিলা দুহাত জড়ো করে বুকে ঠেকিয়ে কুহকিনী হেসে আমাকে সম্ভাষণ জানালেন।

'আমি সুজাতা', বলে বসলেন আমার মুখোমুখি। আমি নমস্কার বিনিময় করে মন্ত্রমুগ্ধের মতো তাকিয়ে রইলাম ওঁর দিকে। এই বয়সে রূপের এতো ঝলক চকিতে চোখ ধাঁধিয়ে দেয়। ঢল নামা যৌবনের উচ্ছলতা ভাসিয়ে নিয়ে যায় মুহূর্তে। দেহের প্রতিটি ভাঁজে খাঁজে বক্রতায় লাবণ্যচঞ্চল যৌন আবেদন। এতো কাছ থেকে এই নারীকে দেখে মাথা ঠিক রাখা কঠিন। রক্তে কামনার আগুন জ্বলে ওঠে দপদপিয়ে।

সুজাতা সম্পর্কে একটা বিষণ্ণ মলিন মধুরিমা সৌন্দর্য আঁকা ছিল আমার চোখে। তার বদলে দেখছি এক লেলিহান অগ্নিশিখা, যার উত্তাপ ছড়িয়ে যাচ্ছে আমার সারা দেহে। স্বচ্ছ সিন্থেটিক বাহারি ফুলকাটা কমলা-রঙ শাড়ির নিচে ব্রা-কাট সংক্ষিপ্ত ব্লাউজ। মুখে সম্ভবত কোনও প্রসাধন ব্যবহার করেননি। ঠোঁট দুটির স্বাভাবিক কমলা রঙ। কপালের মাঝখানে, উড়ন্ত ঈগল ভুরুর ওপরে কমলা রঙের টিপ। চকচকে পালিশ করা খোলা চুল সানসিল্ক শ্যাম্পুর বিজ্ঞাপন যেন।

নন্দিতা আমার প্রেমিকা। তার দেহের গোপন কুঞ্জবনে ভ্রমর হয়ে আমি মধুসিক্ত হয়েছি। সুজাতা তার মা। বোধহয় আমার সমবয়সী। দেখার আগ্রহ ও তীব্র কৌতূহল অবশ্যই ছিল। কিন্তু তার পরিণাম আমাকে কোথায় টেনে নিয়ে যেতে পারে? জানি না। সমস্ত বোধশক্তি হারিয়ে যাচ্ছে।

আমার বিহ্বলতা সুজাতার চোখে ধরা পড়েছে। মায়াবী মউল নিঃসৃত হল ওঁর কণ্ঠে, 'কী হল স্মিথ সাহেব, আপনি এ-জগতে আছেন তো?'

আমার স্বর নিজের কাছে অচেনা মনে হল, 'নিস্তব্ধ মধ্যরাতের মেঘশূন্য আকাশে ভাসমান পূর্ণচন্দ্র মানুষকে কি সম্মোহিত করে? করতেও পারে। কিন্তু আপনাকে দেখে স্বপ্নাবিষ্টের মতন ধ্যানমগ্ন হয়ে যাচ্ছি কেন?'

সুজাতা বললেন, 'আপনার কথাগুলো ঠিক কবিতার মতন। ফুল্‌কির কাছে আপনার কথা অনেক শুনেছি। এখন মনে হচ্ছে, আপনার কণ্ঠস্বর এবং কথায় মেয়েরা চট করে প্রেমের সুবাসে ডুবে যেতে পারে।'

আমি বললাম, 'আসলে সুন্দরী নারী চট করে আমাকে পাগল করে দেয়।'

সুজাতা বললেন, 'আমাকে দেখেও কি আপনার মধ্যে পাগলামির লক্ষণ দেখা দিচ্ছে?'

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনার চোখ কী বলে?'

সুজাতা বললেন, 'জানি না। আপনি সবাইকেই ডোবাতে পারেন।'

আমি কোনও কথা না বলে অপলক ওঁর দিকে চেয়ে রইলাম।

কিছু মুহূর্ত কেটে গেল। উনি আবার বললেন, 'আপনার চোখের দিকে তাকাতে ভয় করে।'

জিজ্ঞেস করলাম, 'কেন?'

উনি বললেন, 'দৃষ্টিটা ভেতরে ঢুকে বিঁধে যায়। আমি ফুল্‌কির মা হতে পারি, কিন্তু আমিও তো মেয়েমানুষ।'

হা ঈশ্বর! সুজাতা আমাকে স্থির থাকতে দিচ্ছেন না। ধমনীতে রক্তের ম্যারাথন শুরু হয়ে গেছে।

সুজাতা উঠে ধীর পদক্ষেপে আমার কাছে এসে দাঁড়ালেন। একটা হাল্কা সুগন্ধের মাদকতায় অবশ হয়ে যাচ্ছি। আমার দুবাহু ধরে দাঁড় করিয়ে দিলেন তিনি। মুখের কাছে মুখ এনে প্রায় চুপি চুপি বললেন, 'ফুল্‌কির কাছে তোমার কথা শুনে ভেতরে ভেতরে তোমার জন্যে পাগল হয়ে গিয়েছি। মনে-প্রাণে কামনা করেছি তোমাকে। তোমার কাছে আমি ফুল্‌কির মা নই, একজন পৃথক নারী হিসেবে তোমার কাছে নিজেকে সমর্পণ করতে চাই।'

আরও ঘন হয়ে শরীরের স্পর্শ দিলেন তিনি। বললেন, 'তোমার বুকে আমাকে পিষে ফেলো, স্মিথ।'

তীব্র আবেগে বুকে চেপে ধরে ওঁর কমলা ঠোঁটে হামলা শুরু করলাম আমি।

আধ ঘণ্টার বেশি সময় কাটল ওঁর বেডরুমে। ভেতরে ভেতরে এতো অস্থির ছিলেন সুজাতা যে, আগেভাগেই নিজেকে উজাড় না-করে স্বস্তি পাচ্ছিলেন না। পরপর দুবার আমাকে নিংড়ে নিলেন তিনি। ওঁর মাখনের মতন মসৃণ, তুলোর মতন নরম অথচ উদ্ধত অহঙ্কারী ঠাসা গতরে আমি যথেচ্ছভাবে হুটোপুটি করেছি। সঙ্গমকালে ওঁর আচরণ, অঙ্গবিক্ষেপ, ছলাকলা ও রতিক্রিয়া নন্দিতার চেয়ে অনেক বেশি উন্নত। সঙ্গমরত অবস্থায় একটা বিরল অভিজ্ঞতা হল আমার—ওঁর যৌনাঙ্গ অনেকটা ঠোঁটের মতন

কাজ করে, কঠিন পুরুষাঙ্গটিকে যেন কামড়ে ধরতে চায়। নারীসঙ্গ কম করিনি, কিন্তু সুজাতা অন্য সকলের তুলনায় ব্যতিক্রম আমার কাছে।

রূপসাগরে শরীর স্নিগ্ধ করে আমরা আবার বসলাম সামনা-সামনি। বিদেশী সুরায় সিক্ত হচ্ছি আমরা। কথা শুরু করলাম আমি, 'আপনার সম্পর্কে যতোটা জানি—'

বাধা দিলেন সুজাতা, 'ফুল্‌কির কাছে যা শুনেছ, তার সবটা ঠিক নয়। অনেক কথা ওকে বানিয়ে বলতে হয়েছে। অনেক অন্তর্জ্বালা, অপমান আর অবহেলা সইতে হয়েছে আমাকে। সব কিছু জানালে ও কষ্ট পেত। তাই সব কথা ওকে বলিনি। ওর বাবা একসময় আমাকে ভোগ করেছে, প্রাচুর্য দিয়েছে কিন্তু আমাকে সুখী করতে পারেনি। ব্যাঙ্গালোরের ঘোড় সাম্রাজ্যে আমি যখন 'রানীমা' তখন সেখানে আমার ভূমিকা হয়ে উঠেছিল অনেকটা মক্ষীরানীর মতন। স্তাবকের দল সব সময় ঘিরে থাকত আমাকে। স্বেচ্ছাচারী জীবনযাপন করেছি তখন। ফুল্‌কির বাবার অনেক ইয়ার-দোস্ত ফুর্তি করতে আসত আমার কাছে। সেই অপমান আমাকে হজম করতে হয়েছিল।'

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'জাস্টিস দিবাকর রায়চৌধুরির সঙ্গে আপনার কি পরে যোগাযোগ হয়েছিল?'

সুজাতা বললেন, 'যোগাযোগ করতে পারতাম, কিন্তু করিনি। ওঁর সামনে দাঁড়াবার সাহস হয়নি আমার। ফুল্‌কির বাবা যদি আমাকে বিয়ে করত, তবেই আত্মপরিচয় দিয়ে ওঁকে ফেস করতে পারতাম।'

জিজ্ঞেস করলাম, 'সুজয় মালিয়াকে আপনি বিয়ের জন্য চাপ দেন নি?'

সুজাতা বললেন, 'দিয়েছি। যথেষ্ট চাপ দিয়েছি। যত চাপ দিয়েছি, তত বৈভবের দিকে আমাকে ঠেলে দিয়েছে সে। যখন বুঝলাম, স্ত্রীর মর্যাদা ও স্বীকৃতি ওর কাছে পাব না, তখন অন্য কাউকে বিয়ে করাও আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। সুজয় মালিয়ার রক্ষিতাকে বিয়ে করার সাহস কারো ছিল না। দূর থেকে অনেকেই আমাকে এত্তেলা পাঠাত, আমার প্রত্যাশী ছিল অনেকে, কিন্তু তাদের উদ্দেশ্য ছিল একটাই—আমাকে কর্ষণ করা। তখনই আমি স্বৈরাচারীর ভূমিকা নিই। সমস্ত ট্রেনার ও জকিদের

আমি করায়ত্ত করি। সকলেই আমার নিয়ন্ত্রণে বাঁধা ছিল। আমার একটা চুম্বনের বিনিময়ে সুজয় মালিয়ার ঘোড়াদের ভাগ্য নির্ধারিত হত। মজার ব্যাপার ছিল, সব জেনেও সুজয় মালিয়ার কিছু করার ছিল না। এটাই প্রমাণ হয়েছিল, নারীশক্তির কাছে পুরুষের বিত্ত অনেক তুচ্ছ। এই আলিপুর এলাকায় আশরাফ নামে এক প্রাইভেট বুকির মাধ্যমে অনেক দরিদ্র মানুষ এবং আর. সি. টি. সি.-র চতুর্থ শ্রেণীর কর্মীরা দু-পয়সা কামিয়ে নিত আমার কল্যাণে।'

জানতে চাইলাম, 'কী রকম?'

সুজাতা বললেন, 'রেস সম্পর্কে আশরাফের দূরদর্শিতা, গণনা এবং সম্ভাব্য ফলাফলের ব্যাপারে স্বোপার্জিত একটা ঐশী শক্তি ছিল। আশরাফের নির্বাচন অনুযায়ী বহু পান্টার খুব অল্প পয়সায় বাজি লাগাত। ওর প্রেডিকশন অদ্ভুতভাবে মিলে যেত। প্রচুর লোক খেলত ওর নির্দেশমতো এবং জিতেও যেত।

'সেই সময় কোচবিহারের রানী, রাজার দ্বিতীয় পক্ষ, ব্রিটিশ শ্বেতাঙ্গিনী জিনা নারায়ণ এই আলিপুর এলাকাতেই থাকতেন। কোচবিহারের রাজা তখন পরলোকে। জিনা নারায়ণ তাঁর অনুগত মরদ মিস্টার লাল-এর সঙ্গে সহবাসী ছিলেন। তাঁর আরদালি মহম্মদ ভাই সকালে যেত আশরাফের কাছে টিপ্‌স্ আনতে। জ্যাকপট, ট্রিবল টোট-এর টিপ্‌স্ লিখে নিয়ে রানীকে গিয়ে দিত। রানী সেই টিপ্‌স্ অনুযায়ী খেলতেন এবং জিততেন।

'একবার আশরাফের টিপ্‌স্ অনুযায়ী রানী জ্যাকপট পেলেন। আশরাফকে ডেকে পাঠালেন রানী। আশরাফ নিজে এসে রানীকে সেলাম জানিয়ে দশ হাজার টাকা রাখলেন রানীর সামনে।

'কোচবিহার মহারাজের নামে একটি কাপের বাজি তখন আসন্ন। রানীর ঘোড়া দৌড়বে সেই রেসে। সমস্ত ঘোড়ার ওপর আশরাফের নজরদারি ছিল। রানীর একটি ঘোড়ার নাম ছিল গোলাগাং। ফিলি। উইম্বলডন খেতাবজয়ী নিগ্রো মহিলা ইভান গোলাগাং-এর নামানুসারে সেই ঘোড়ার নাম রাখা হয়েছিল। বম্বে থেকে সেই ঘোড়াকে কলকাতায় আনা হয় কাপের বাজিতে দৌড় করানোর জন্যে। আশরাফ তার মেরিট দেখে বলে দেয়, হ্যান্ডিক্যাপ বেটার হলে সেই ঘোড়া জিতবে। তার ভবিষ্যদ্‌বাণী

ছিল, রানীর দশ নম্বর ঘোড়া 'দ্য কমেডিয়ান' বাজিমাৎ করবে। কিন্তু দশ নম্বর ঘোড়ার দক্ষতা সম্পর্কে রানীর সন্দেহ ছিল। আশরাফ তখন জানায়, ট্রেনার ঘোড়াকে বেঁধে রেখেছে। জকিকে নির্দেশ দেওয়া আছে, ঘোড়াকে টেনে রাখতে। আসল দিনে ওই ঘোড়াই বাজি মারবে।

'সত্যিই তাই হয়েছিল। দশ নম্বর ঘোড়া 'দ্য কমেডিয়ান' উইন পেয়ে কাপ পাইয়েছিল রানীকে। আশরাফকে রানী এক হাজার টাকা টিপ্‌স্ দেন। এটা ছিল পুরোপুরি আপসেট উইন। কিন্তু আশরাফের প্রেডিকশন মিলে গিয়েছিল হুবহু।

'ফুল্‌কি যখন ব্যাঙ্গালোরে ঘোড়-সাম্রাজ্য সামলাচ্ছে, ও কিন্তু তখন জানে না, কলকাতায় বসে আমি সেখানকার কলকাঠি নাড়ছি। কলকাতার রেসে কোন্ কোন্ ঘোড়া নামবে, কোন্ ট্রেনারের তত্ত্বাবধানে কে রাইড করবে, বহু আগে থেকে আমার নির্দেশে এসব ঠিক হয়ে যায়। আশরাফকে ডেকে আপসেট উইন-এর খবরগুলো আগে-ভাগে বলে দিতাম। সেই অনুযায়ী আশরাফ পান্টারদের খেলাত এবং তারা দুপয়সা রোজগার করত।'

আমি বললাম, 'একটা কথা বলি?'

সুজাতা বললেন, 'বলো।'

আমি বললাম, 'বয়েস আপনার যা-ই হোক না কেন, হঠাৎ দেখে আপনাকে নন্দিতার যমজ বোন বলে মনে হয়েছিল। এখনও আপনার স্বাস্থ্যের যা বাঁধুনি, বিছানায় আপনার ভূমিকা যতটা সুনিপুণ—এখনও বহু বছর আপনাকে যুবতীর আসনে অবস্থান করতে হবে। বাকি জীবনটা কিভাবে কাটবে আপনার?'

মুচ্‌কি হেসে সুজাতা বললেন, 'তুমি যা-ই বলো না কেন, এখনও তুমি আমাকে ফুল্‌কির মা ছাড়া অন্য কিছু ভাবতে পারছ না।'

জানতে চাইলাম, 'এ কথা বলছেন কেন?'

সুজাতা বললেন, 'যে-নারী তার লজ্জার মাথা খেয়ে সদ্য পরিচিত এক পুরুষকে পুরোপুরি নগ্নদেহ নিবেদন করতে পারে, সে-নারীকে সেই পুরুষ কতক্ষণ আপনি-আজ্ঞে করে যাবে?'

হেসে ফেললাম আমি। দুষ্টুমি করে বললাম, 'যতক্ষণ না সেই নারী সেই পুরুষকে আরও একবার চুম্বনে আহ্বান করবে।'

সুজাতা চোখ বড় করে কপট শাসনের ভঙ্গি করলেন। তারপর হেসে বললেন, 'বিচ্ছু বদমায়েস একটা! থেকে যাবে আজ? সারারাত যা-খুশি কোরো!'

ঠিক নন্দিতার মতোই শোনাল কথাটা। যে-ভাবে ও থেকে যেতে বলেছিল রাতে।

আমি বললাম, 'এক কাজ করবে সুজাতা? চলো, ক'দিনের জন্যে কোথাও ঘুরে আসা যাক। পরিচিত মুখের আড়ালে, নির্জন কোনও জায়গায়। যাবে?'

ঝলকে উঠল সুজাতার মুখ। আশাতীত উচ্ছ্বাসে বালিকাসুলভ ভঙ্গিতে বলল, 'কী দারুণ বলেছ, স্মিথ! আমার মনের কথাটাই তোমার মুখ দিয়ে বেরিয়েছে। আসলে আমি তো জানি না, তোমার ওপর আমার অধিকার কতটা, কতটা দাবি করতে পারি তোমার কাছে, তাই ভরসা হয়নি। যেখানে খুশি নিয়ে চলো আমাকে।'

আমি স্থির হয়ে ওকে দেখলাম কিছুক্ষণ। তারপর অলস পায়ে ধীরে ধীরে ওর কাছে গিয়ে পাশে বসলাম। বাহুবন্ধনে বেঁধে ওকে কাছে টেনে নিলাম। মুখে মুখ ঠেকিয়ে বললাম, 'একটা কথার উত্তর দাওনি তুমি। জিজ্ঞেস করেছিলাম, তোমার বাকি জীবনটা কীভাবে কাটবে। ভেবে বোলো। এক জীবনে যতটা অধিকার আর দাবি প্রয়োজন, সবটা নিও তুমি।'

ও আমাকে অবাক করে দিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'তাহলে ফুল্‌কির জন্যে কিছুই রাখছ না?'

মেয়ের প্রতি পরিষ্কার ঈর্ষার ইঙ্গিত পেলাম যেন। একটু ধন্দে পড়ে গেলাম। কী বলব ভাবছি।

ও আমার নিচের ঠোঁটে মৃদু কামড় দিয়ে বলল, 'ভয় নেই। তুমি দিতে চাইলেও পুরোটা আমি নেব না। শুধু ফুল্‌কি নয়, যে-কোনও মেয়েকে আমি হিংসে করতে পারি তোমার ব্যাপারে। এমনকি, তোমার জোড়া বউকেও!

সুজাতাকে নিয়ে উড়িষ্যার অরণ্যে অরণ্যে কাটিয়ে গতকাল ফিরেছি। আবেগে, আচরণে, প্রেমে, সম্ভ্রমে, সম্ভোগে—সবদিক থেকে মা ছাড়িয়ে গিয়েছে মেয়েকে। অতলস্পর্শী রহস্যময়ী হিসেবে সুজাতা গভীর দাগ

কেটেছে আমার মনে। পরিণত বয়সে প্রেমের ব্যাপ্তি এক অননুভূত মাধুর্যে স্থাপন করেছে আমাদের। কালকের দিনটা পুরো আচ্ছন্নতায় কেটে গিয়েছে।

আজ বুলু ফোন করেছিল। আগামীকাল ও আসছে বম্বে থেকে। ওখানকার কর্মসূচি একরকম পাকা।

সুজাতা ফোন করেছিল একটু আগে। দুদিন আগেই নন্দিতা ফিরেছে কলকাতায়। ফিরে এসে সুজাতার কোনও হদিশ না পেয়ে ভাবনায় পড়েছিল। আমার অফিসে ফোন করে জেনেছে, আমি কলকাতায় নেই। আমি ঠিক বুঝতে পারছি না, মা এবং মেয়ের মাঝখানে আমার ভূমিকা কী হওয়া উচিত। নন্দিতাকে বিসর্জন দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। সরল বিশ্বাসে ও আমার সব কথা সুজাতাকে বলেছে। কিন্তু সুজাতা ওকে কিছুই বলতে পারবে না। নন্দিতার একদিকে আলো, অন্যদিক অন্ধকারে। সুজাতার দুদিকই আলোকিত, আমারও তা-ই—কাউকেই উপেক্ষা করতে পারি না আমি।

কলকাতায় উইন্টার রেস শুরু হয়ে গিয়েছে। এখনও শীত তেমন জাঁকিয়ে পড়েনি। দুর্গা পুজোর শেষে মনটা কেমন উদাস হয়ে যায়। চট করে কাজে-কর্মে মন বসতে চায় না। আকাশের নীল রঙটা হৃদয়ে মিশে যায়। সবই কেমন যেন শূন্য শূন্য মনে হয়। নন্দিতাকে নিয়ে একটা গোটা দিন কাটালাম কলকাতার বাইরে, একটা রিসর্টে। কিন্তু খুব একটা মনোযোগী হতে পারিনি ওর প্রতি। সম্ভবত সেটা ও বুঝতেও পেরেছে। ফলে, আরও বেশি মন খারাপ হয়ে যায় আমার। ওকে দুঃখ দেবার কোনও অধিকার তো আমার নেই। সুজাতার সঙ্গে সম্পর্কের ব্যাপারটা ও জানে না, কিন্তু তার প্রতিক্রিয়া তো আমার মধ্যে কাজ করে যাচ্ছে। ফলে, আমার মধ্যে একটা সূক্ষ্ম পরিবর্তন সম্ভবত ওর চোখে ধরা পড়েছে।

বুলু কলকাতায় এসে তিন দিন থেকে আবার বম্বে ফিরে গিয়েছে। আপাতত ইভিনাই ওর ঠিকানা। কলকাতার বউ। গত শনিবার ওকে নিয়ে রেসের মাঠেও গিয়েছিল। কিছু টাকা গচ্চাও দিয়ে গেছে। আর দু সপ্তাহ পরে রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়ামে 'দিলীপকুমার নাইট' উদযাপিত হবে। কলকাতা ও শহরতলিতে রীতিমতন সোরগোল পড়ে গিয়েছে। বম্বে ও কলকাতার বাছাই স্টার ও শিল্পীদের সমাবেশ ঘটবে স্টেডিয়ামে। ইভিনার

কাছে শুনলাম, বুলু কুড়ি-বাইশ জনের একটা টীম তৈরি করেছে কলকাতায়। তার মধ্যে কিছু মাস্তান ও সমাজবিরোধীও আছে। তারা সর্বক্ষণ চষে বেড়াচ্ছে কলকাতা। লেটেস্ট খবরাখবর তারা ফোনে জানিয়ে যাচ্ছে বম্বেতে বুলুকে। টালা থেকে টালিগঞ্জে গোটা দশেক বিখ্যাত বিপণন সংস্থা থেকে টিকিট বিক্রির ব্যবস্থা হয়েছে। টিকিটের কাট্‌তিও আশানুরূপ।

অনুষ্ঠানের নির্ধারিত দিন শনিবার। সন্ধ্যা ছ'টা থেকে অনুষ্ঠান শুরু হবে। চলবে ভোররাত্রি পর্যন্ত। শনিবার বেলা বারোটা থেকে চব্বিশ ঘণ্টার জন্য প্রায় গোটা গ্র্যান্ড হোটেলটা বুক করা হয়েছে। বম্বের মেগাস্টাররা শনিবার সকালের প্লেনে কলকাতায় আসবে। রবিবার দুপুরের ফ্লাইটে বম্বে ফিরে যাবে। কলকাতা ও বম্বের শিল্পীদের অর্ধেক টাকা দিয়ে চুক্তিপত্র সই করানো হয়েছে। বাকি অর্ধেক টাকা শনিবার বিকেল পাঁচটার মধ্যে দিতে হবে। বম্বের শিল্পীদের আসা-যাওয়ার প্লেনের টিকিট চুক্তির সঙ্গে সঙ্গে দিয়ে দেওয়া হয়েছে।

আজ শুক্রবার। মাঝে আর সাতটা দিন বাকি। সকালের ফ্লাইটে বুলু আজ কলকাতায় এসেছে। বুলু জানিয়েছে, একটি টিকিটও আর পড়ে নেই। সব বিক্রি হয়ে গিয়েছে। আশাতীত লাভের সম্ভাবনার ইঙ্গিত দিয়েছে বুলু।

আগামীকাল কলকাতায় ইনভিটেশন কাপের বাজি। ইংল্যান্ডের রানীর জকি লেস্টার পিগট আর-সি-টি-সি'র বিশেষ আমন্ত্রণে কলকাতায় এসেছে। লেস্টার পিগট এই মুহূর্তে বিশ্বের সেরা রাইডার। আর কলকাতার একচ্ছত্র অধিপতি রেমেডিয়াসের তুল্য জকি ভারতে দুটি নেই। পৃথিবীবিখ্যাত এই দুই জকি আগামীকাল ক্যালকাটা রেসকোর্সের প্রধান আকর্ষণ। টপ ফেভারিট ঘোড়া 'নেম দ্য টিউন'-এর জকি রেমেডিয়াস। 'লর্ড অব দ্য ম্যানর'-এর জকি লেস্টার পিগট। হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হবে। সঙ্গে দৌড়বে আরও ছটি ঘোড়া। পান্টাররা বাজি ধরবে ঘোড়াদের ওপর নয়। দুই বিখ্যাত জকিদের ওপরই পান্টারদের লক্ষ্য।

আগামীকাল বুলু আমার সঙ্গে মাঠে যাবে। ইভিনাকে আনতে বারণ করেছি। কেননা, আমার সঙ্গে নন্দিতা থাকবে। আজকের গোপন সন্ধ্যাটা কাটবে সম্ভবত সুজাতার সঙ্গে।

মাঠে ঠাসাঠাসি ভিড়। দুটো রেস হয়ে গিয়েছে। তৃতীয় রেস ইনভিটেশন কাপের। 'নেম দ্য টিউন'-এর দর পঞ্চাশ পয়সা আর 'লর্ড অব দ্য ম্যানর' আরও ফেভারিট লেস্টার পিগটের জন্য। তার দর চল্লিশ পয়সা। এই দুটি ঘোড়ার প্লেসে কোনও দর নেই। বাকি ছ'টা ঘোড়ার দর অবিশ্বাস্য। কুড়ি টাকা থেকে পঞ্চাশ টাকা।

বুলু 'লর্ড অব দ্য ম্যানর'-এ এক লাখ টাকা লাগিয়ে দিল। ঘোড়া জিতলে এক লাখ চল্লিশ হাজার পাবে। অবশ্যই ট্যাক্সের টাকাটা কেটে নেবে। আমি পুরনো রেকর্ড বিচার করে 'নেম দ্য টিউন'-এ পঞ্চাশ হাজার খেলে দিলাম। টানটান উত্তেজনায় রেস শুরু হল। বারোশো মিটারের দৌড়। পাঁচ নম্বর লেন থেকে বেরিয়ে প্রথমেই রেমেডিয়াস রেলিং ধরে ফেলল। ফার্স্ট বেন্ড-এ রেমেডিয়াস পিগট-এর চেয়ে অন্তত তিন লেংথ এগিয়ে। সেকেন্ড বেন্ড-এ পিগট এক লেংথ পেছিয়ে। ডিসট্যান্ট পোস্ট ছাড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে হাড্ডাহাড্ডি শুরু হল। কে উইন করবে বোঝা মুশকিল। কিন্তু না, পিগটের ঘোড়াই নেক-টু-নেক হয়ে রেমেডিয়াসকে ছাড়িয়ে যাচ্ছে। উইনিং পোস্ট কে আগে ছুঁয়েছে, বোঝা গেল না। কমেন্টেটর জানিয়ে দিল ফটো ফিনিশে রেজাল্ট জানানো হবে। একটু পরেই আবার ঘোষণা—স্টুয়ার্ডস্ এনকোয়্যারি হচ্ছে। ফটো ফিনিশ এবং স্টুয়ার্ডস্ এনকোয়্যারির পর ফলাফল জানানো হবে। কী কারণে স্টুয়ার্ডস্ এনকোয়্যারি, তা জানা গেল না।

নন্দিতা আর বুলুকে কিছু না বলে আমি উঠে পড়লাম। আর-সি-টি-সির মেম্বার হিসেবে কিছু স্টুয়ার্ডের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ছিল। পেয়ে গেলাম একজনকে। শুনলাম, রেমেডিয়াস-এর সঙ্গে লেস্টার পিগটের বচসা হয়েছে। রেমেডিয়াসের অভিযোগ, লেস্টার ইচ্ছাকৃতভাবে 'নেম দ্য টিউন'-এর নাকে ছপটি মেরেছে। সেই কারণেই রেমেডিয়াসের ঘোড়া উইন পায় নি। লেস্টার বিনীতভাবে রেমেডিয়াসের সঙ্গে ব্যাপারটা মিটিয়ে নিতে চেয়েছিল। তার বক্তব্য, ইচ্ছাকৃত নয়, দুর্ভাগ্যবশত তার ছপ্‌টি 'নেম দ্য টিউন'-এর নাকে লেগে গিয়েছে। এ-নিয়ে রেমেডিয়াস যেন কোনও

অভিযোগ না করে স্টুয়ার্ডের কাছে। পরে যে কোনও একটা বাজিতে লেস্টার রেমেডিয়াসকে রেস জিতিয়ে দেবে। নিজেদের মধ্যে বোঝাপড়া করে ব্যাপারটা মিটিয়ে নিতে চেয়েছিল লেস্টার। কিন্তু রেমেডিয়াস লেস্টারের প্রস্তাব গ্রাহ্য না করে স্টুয়ার্ডের কাছে অভিযোগ করে বসেছে।

ক্লোজ সার্কিট টিভিতে পুরো রেস ওয়াচ করা হল। দেখা গেল, ডিসট্যান্ট পোস্ট পেরুবার মুহূর্তে লেস্টার রেমেডিয়াসকে ধরবার সঙ্গে সঙ্গেই 'নেম দ্য টিউন'-এর নাকে ছপ্‌টি চালিয়েছে। স্লো মোশনে বারবার দেখে স্টুয়ার্ড 'নেম দ্য টিউন'-কে উইন ঘোষণা করল।

বুলু হেরে গেল। আমি জিতলাম। লেস্টার পিগট-এর মুখ লজ্জায় রাঙা হয়ে গেল। উল্লাসে ফেটে পড়ল রেমেডিয়াস। পেমেন্ট নিয়ে আর দাঁড়ালাম না। নন্দিতা আর বুলুকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম।

বুলুর মেজাজ বিগড়ে আছে। বেঘোরে এক লাখ টাকা চলে গেল। মুহূর্তের জন্য ঝল্‌কে উঠেও শেষ পর্যন্ত চুপ্‌সে গেছে বুলু। আমি ওদের নিয়ে সোজা গেলাম হোটেল হিন্দুস্থান ইন্টারন্যাশন্যাল-এ। বুলু দু পেগ স্কচ এক ঢোকে গিলে ফেলল। একটা অস্থিরতায় ভুগছে ও। আড়ে আড়ে দেখছে নন্দিতাকে। মনে হচ্ছে, ঠিক দেখছে না—নন্দিতাকে ও মাপছে। হঠাৎ 'এক্সকিউজ মি' বলে আমাকে ইশারায় ডেকে আড়ালে নিয়ে গেল। বলল, 'মেজাজটা খিট্‌কেল হয়ে গেছে। নন্দিতাকে পাওয়া যাবে?'

আমি বললাম, 'নন্দিতা বড় ঘরানার মেয়ে। আমার সঙ্গে শুয়েছে। কিন্তু কারোর জন্যে ওকে আমি প্রস্তাব করতে পারি না। তাতে ও ভীষণ অপমানিত বোধ করতে পারে।'

বুলু বলল, 'তাহলে আমাকে ইভিনার কাছে পৌঁছে দে। নারী ছাড়া এক মুহূর্ত ভালো লাগছে না।'

আমি বললাম, 'ট্যাক্সি আনিয়ে দিচ্ছি, তুই চলে যা। আমি নিরিবিলিতে নন্দিতার সঙ্গে একটু সময় কাটাতে চাই।'

ও বলল, 'ঠিক আছে। কাল তোর সঙ্গে দেখা হবে। ভালো কথা, তোর গাড়িতে আমার অ্যাটাচিটা রয়েছে। ওতে পনেরো লাখ টাকা আছে। ওখান থেকে তুই তোর টাকাটা নিয়ে নিস। বাকিটা নিয়ে পরশু আমি বম্বে যাব। সামনের শুক্রবার সকালে আমি এসে যাব।'

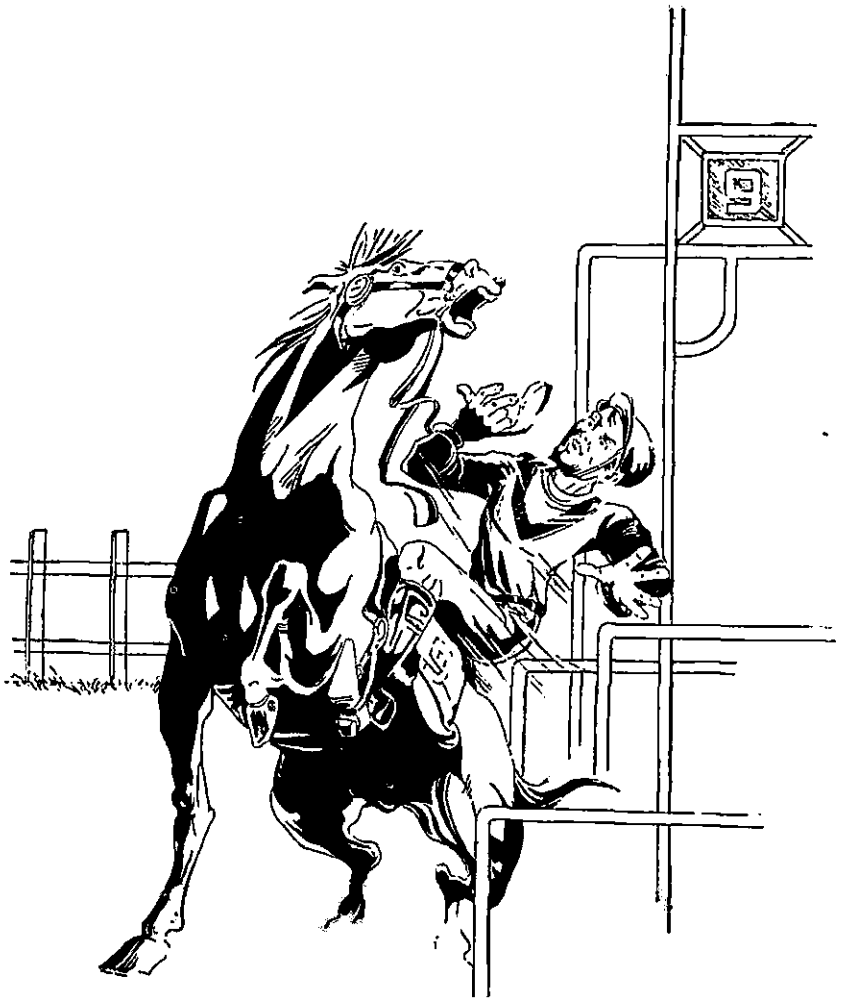

রেস শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে আসলাম পড়ে যায় ঘোড়ার পিঠ থেকে

আমি বললাম, 'ঠিক আছে।'

ওকে ট্যাক্সি আনিয়ে দিলাম। আমাদের কাছে বিদায় নিয়ে ও চলে গেল।

কিছু সময় কাটার পর নন্দিতা আমাকে নিয়ে ওর ফ্ল্যাটে যেতে চাইল। আমি রাজি হয়ে গেলাম। রেডি টু ফ্রাই চিকেন সসেজ আর একটা হুইস্কির বোতল নিয়ে নন্দিতার ফ্ল্যাটে হাজির হলাম। আমি বোতল খুলে বসে গেলাম। নন্দিতা কিচেনে ঢুকল চিকেন সসেজ ভাজতে। একটু পরেই ও এসে গেল ভাজা চিকেন সসেজ নিয়ে। হুইস্কি ঢেলে ওকে গ্লাস এগিয়ে দিলাম। গ্লাসে চুমুক দিয়ে ও বলল, 'মা তোমার সঙ্গে আলাপ করতে চেয়েছে।'

কথাটা শুনে আমি প্রায় চমকে উঠলাম। আমার সঙ্গে গোপন সম্পর্কটা সুজাতা বোধহয় স্বাভাবিক করতে চাইছে। যাতে নিউ আলিপুরের বাড়িতে আমার যাতায়াতটা অবাধ হয় এবং কোনওরকম সন্দেহের অবকাশ না থাকে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'কেন?'

ও বলল, 'মা তোমার কথা অনেক শুনেছে আমার কাছে। তোমাকে দেখতে চায়।'

আমি বললাম, 'কী বলেছ আমার সম্পর্কে?'

ও বলল, 'সবই বলেছি। তোমাকে যতটা জানি চিনি।'

আমি অভিনয়ের ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করলাম, 'আমাদের বিছানার সম্পর্কের কথাও বলেছ নাকি?'

ওর নির্বিকার স্বীকারোক্তি, 'হ্যাঁ, সবই বলেছি।'

আমি তো সবই জানি। তবু বললাম, 'এটা বোধহয় তুমি ঠিক করো নি।'

ও বলল, 'ইচ্ছে করেই বলেছি। মাকে আমি বিশ্বাস করি না। মেয়ের প্রেমিকের দিকে মা যাতে হাত না বাড়ায়, তাই আগেভাগেই বলে দিয়েছি।'

আমার সন্দেহ হল, নন্দিতা বোধহয় কিছু গোপন করছে। ও কি কিছু আঁচ করেছে?

আমি স্বাভাবিক স্বরে বললাম, 'তাহলে আলাপ না হওয়াই ভালো। কাছে এসো, তোমাকে একটু আদর করি।'

একটু কঠিন স্বরে নন্দিতা বলল, 'ভালো লাগছে না।'

ওকে ঘাঁটাতে আর সাহস হল না। গ্লাসে চুমুক দিয়ে পুরো হুইস্কিটা গলায় ঢেলে দিল ও। আমি সাহস হারাচ্ছি। ভেতরে ভেতরে পালাতে চাইছি ওর কাছ থেকে। জিজ্ঞেস করলাম, 'তুমি কি আজ এখানেই থাকবে?'

সে-কথার উত্তর না দিয়ে ও নিজেই হুইস্কির বোতলটা হাতে নিল। আমি সঙ্গে সঙ্গে ওর হাত থেকে বোতলটা নিয়ে ওর গ্লাসে হুইস্কি ঢেলে দিলাম। আবার জিজ্ঞেস করলাম, 'তুমি আজ বাড়ি ফিরবে না?'

ও গ্লাসে চুমুক দিল। বলল, 'ফিরব। তোমাকে সঙ্গে নিয়ে। আজ মার সঙ্গে তোমাকে আলাপ করিয়ে দেব। তুমি কি আজ আমার সঙ্গে থাকতে পারবে?'

আমি বললাম, 'অসম্ভব। নিউ আলিপুরের বাড়িতে আমি তোমার সঙ্গে থাকতে চাই না।'

ও আমার চোখের দিকে অপলক তাকিয়ে রইল। আমি দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলাম।

ও চট করে উঠে গিয়ে রিসিভার তুলে ডায়াল করতে শুরু করল। শুনতে পেলাম, 'হ্যাঁ, আমি ফুল্‌কি। ফ্ল্যাটে আমার গাড়িটা পাঠিয়ে দাও।'

ও ফিরে আসতে বললাম, 'গাড়ি পাঠাতে বললে কেন? আমিই তো তোমাকে পৌঁছে দিতাম।'

ও বলল, 'তোমাকে ট্রাবল দিতে চাইছি না। যদি আজ আমার সঙ্গে থাকতে তাহলে তোমার সঙ্গে ফিরতাম।'

আমি বললাম, 'আমি তো থাকতে অরাজি নই। এখানেই থেকে যেতে পারো আজ।'

ও দৃঢ়ভাবে বলল, 'না। আমি মা-র সামনে তোমাকে নিয়ে দরজা বন্ধ করতে চাই।'

কথাটা শুনে আমার বুক কেঁপে উঠল। কোনও কারণ ছাড়া ও একথা বলতে পারে না। ধরা পড়লেও আমার কিছু করার নেই। তবু তো জানা দরকার। আমি বললাম, 'মাপ করো। তোমার এবং তোমার মায়ের কোনও দ্বন্দ্বে আমি নিজেকে জড়াতে চাই না।'

ও একটু হাসলো। রীতিমতন রহস্যের হাসি। বলল, 'জড়িয়ে তুমি যাবেই। যাতে না জড়াও তার জন্যেই আমি এই ব্যবস্থা নিতে চাই।'

আমি যে সুজাতার সঙ্গে কী ভীষণভাবে জড়িয়ে গিয়েছি তা তো নিজেই জানি। ওরা কেউই আমার জীবনসঙ্গিনী হবে না, তবু দুজনে দুজনের প্রতি এতো ভয়ঙ্কর ঈর্ষান্বিত, ভাবা যায় না। আমি উঠে ওর কাছে এগিয়ে গেলাম। দু বাহু ধরে ওকে দাঁড় করিয়ে ঠোঁটে ঠোঁট ছোঁয়ালাম। গভীর আবেগে ওকে বললাম, 'মিছিমিছি উল্টোপাল্টা ভেবে মন খারাপ করছ। কোনও কিছুর বিনিময়েই তুমি আমার কাছ থেকে হারিয়ে যেতে পারো না। চলো, তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসি।'

নন্দিতার চোখ দিয়ে টপটপ করে জলের ফোঁটা গড়াতে লাগল। নিজেকে ভয়ঙ্কর অপরাধী মনে হল আমার। অথচ, সত্যিই আমার কিছুই করার ছিল না। সবই নিয়তি!

গতকাল শুক্রবার নির্ধারিত সময়েই বুলু বম্বে থেকে কলকাতায় এসে গিয়েছে। আজ সকাল থেকে সাজ-সাজ রব। এয়ারপোর্টে শিল্পীদের অভ্যর্থনা জানানো এবং গ্র্যান্ড হোটেলে আনার দায়িত্ব দিয়েছে আমায় বুলু। হোটেলে দেখভালের দায়িত্বও আমার। কলকাতার শিল্পীরাও মিলিত হবে গ্র্যান্ডে। পাঁচটার আগেই বুলু গ্র্যান্ডে আসবে এবং আমরা সবাই একটা লাক্সারি কোচে সেখান থেকে সোজা যাব রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়ামে।

যথাসময়ে আমি এয়ারপোর্টে পৌঁছে গেলাম। নির্ধারিত সময়ে প্লেন ল্যান্ড করল। প্রচুর দর্শনার্থী ভিড় করেছে এয়ারপোর্টে। তাদের কবল থেকে বাঁচিয়ে নিরাপত্তাবাহিনী ও পুলিশ শিল্পীদের তুলে দিল লাক্সারি

কোচে। সেখান থেকে সোজা এলাম গ্র্যান্ড হোটেলে। সেখানেও দর্শনার্থীর প্রচণ্ড ভিড়। পুলিশে পুলিশে ছয়লাপ। লাঠিচার্জ করে পুলিশ ভিড় হটিয়ে শিল্পীদের ঢুকিয়ে দিল গ্র্যান্ডে। বিকেল চারটের মধ্যে কলকাতার শিল্পীরাও সবাই এসে গেল।

কালু মিঞাকে দিয়ে গাড়ি পাঠিয়ে দিলাম বাড়িতে। আমার জোড়া বউ ছটার আগেই পৌঁছে যাবে স্টেডিয়ামে। ভি. আই. পি. এনক্লোজারে ওদের বসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। নন্দিতা আমার সঙ্গে যেতে চেয়েছিল। কিন্তু হিয়া আর পিয়ার সামনে ওকে নিয়ে যেতে চাই না। তাই, ও একাই চলে যাবে এবং ভি. আই. পি. এনক্লোজারেই ওর আসনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সুজাতাও আসতে চেয়েছিল। আমি রিস্ক নিইনি।

বিকেল সাড়ে চারটেয় বুলুর ফোন পেলাম। বুলু বলল, 'ভালো করে শোন্ তড়িৎ—আমি লালবাজার পুলিশ হেড কোয়ার্টার থেকে বলছি। স্টেডিয়ামে যদিও প্রচুর পুলিশ এবং নিরাপত্তা রক্ষী থাকছে, তবুও আমি ঠিক স্বস্তি পাচ্ছি না। আমি আরও ফোর্স দিতে চাই। সেই ব্যবস্থাটা করার জন্যেই লালবাজারে এসেছি। তুই এখনই দিলীপকুমারকে নিয়ে স্টেডিয়ামে চলে যা। এবং অবশ্যই লাক্সারি কোচে যাবি। স্টেডিয়ামে আমার ছেলেরা তোর জন্যে অপেক্ষা করে আছে। সোজা সিকিউরিটি এনক্লোজারে কোচটা ঢুকিয়ে দিবি। ঠিক ছটায় দিলীপকুমারের একটা সংবর্ধনার ব্যবস্থা করা আছে। ছেলেরা সব জানে। তুই পৌঁছে কোচটা আবার গ্র্যান্ডে ফেরৎ পাঠাবি। আমি সব শিল্পীদের নিয়ে ঠিক সময়ে পৌঁছে যাব।'

আমি 'ঠিক আছে' বলতেই ও লাইন কেটে দিল।

দিলীপকুমারকে নিয়ে লাক্সারি কোচে আমি রওনা হয়ে গেলাম। স্টেডিয়ামের সিকিউরিটি এনক্লোজারে প্রচুর পুলিশ ও প্রাইভেট সিকিউরিটি থিক থিক করছে। কোচের সমস্ত জানালা বন্ধ ছিল। কাচে কালো ফিল্ম লাগানো বলে বাইরে থেকে কেউ কিছু দেখতে পাচ্ছিল না। ফলে, সবাই

ধরে নিয়েছে, এতো বড় একটা কোচে নিশ্চয়ই সব শিল্পীরা এসে গিয়েছে। পুলিশ ও নিরাপত্তা বাহিনীর তত্ত্বাবধানে কোচ ভেতরে ঢুকে গেল।

বুলুর টীমের কয়েকজন ছেলে দিলীপকুমারকে ড্রেসিংরুমে নিয়ে গেল। আমি দেখলাম, সারা স্টেডিয়ামে ভিড় উপচে পড়ছে। যেদিকেই তাকাই—শুধু মানুষের মাথা। জনসমুদ্র। ভি. আই. পি. এনক্লোজারে সংরক্ষিত আসন তখনও পুরোপুরি পূর্ণ হয়নি। পুলিশ ব্যারিকেড করে পুরো চত্বরটাকে ঘিরে রেখেছে। বাইরে মাউন্টেড পুলিশ টহল দিচ্ছে।

পৌনে ছ'টায় কোথাও আর খালি জায়গা চোখে পড়ে না। লাক্সারি কোচটা আমাদের নামিয়ে দিয়েই ফিরে গেছে গ্র্যান্ডে। শিল্পীদের নিয়ে বুলু এখনও আসেনি। ছ'টা বাজতে পাঁচে দিলীপকুমারকে মঞ্চে আনার সঙ্গে সঙ্গে তুমুল হাততালি আর উল্লাসে ফেটে পড়ল গোটা স্টেডিয়াম। বুলুর একজন মাতব্বর মাইকে কী বলতে গেল বুঝতে পারলাম না। চিৎকার চেঁচামেচিতে বুঝতে পারলাম কেউ কিছু শুনতে পাচ্ছে না। মাইক ফেল্ করেছে। বুলুর মাতব্বর মঞ্চের সামনে এগিয়ে এসে চিৎকার করে বলছে—'আপনারা দয়া করে একটু শান্ত হন। মাইক এখনই ঠিক হয়ে যাবে। সমস্ত শিল্পীরা এসে গেছেন। দিলীপকুমারকে সংবর্ধনা দেবার পরই আমরা অনুষ্ঠান শুরু করব। আপনারা দয়া করে...'

কোনও শিল্পীই তখনও এসে পৌঁছয়নি। মিথ্যা বলে ছেলেটি জনতাকে শান্ত করতে চাইছে। মিনিট দশেক কেটে গেল। শাল গায়ে দিলীপকুমার মঞ্চে বসে আছেন। মাইক তখনও নীরব। চিৎকার চেঁচামেচি বাড়ছে। ঘন ঘন সিটি মারছে দর্শক-শ্রোতাদের মধ্যে থেকে। হঠাৎ একটা ফোল্ডিং চেয়ার উড়ে এসে পড়ল মঞ্চে। খুব জোর বেঁচে গেলেন দিলীপকুমার। আর একটু হলে তিনি আহত হতে পারতেন। সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটি ছেলে দিলীপকুমারকে ঘিরে ভেতরে নিয়ে গেল। মুহূর্তে শত শত ফোল্ডিং চেয়ার শূন্যে উড়তে শুরু করল। স্টেডিয়ামে লাগানো অস্থায়ী আলোগুলো ভেঙে চুরমার করছে কিছু লোক। স্টেডিয়ামের আলো কমতে শুরু করেছে।

খণ্ডযুদ্ধ লেগে গিয়েছে চারপাশে। বিক্ষিপ্তভাবে চতুর্দিকে আগুন জ্বলতে শুরু করেছে। চিৎকার চেঁচামেচি ধাক্কাধাক্কি আর্তনাদে সারা স্টেডিয়াম অগ্নিগর্ভ। মানুষ পালাচ্ছে। প্রাণের ভয়ে চিৎকার করে কাঁদছে। মানুষের চাপে, ঠেলাঠেলিতে শত শত মানুষ পদদলিত হয়ে যাচ্ছে। সারা মাঠ ভাঙা চেয়ারে ভর্তি। তারই মধ্যে সুযোগসন্ধানীরা মেয়েদের বেইজ্জত করছে। শাড়ি-জামা ধরে টানাটানি করছে, ছিঁড়ে দিচ্ছে। যুবতী মেয়েদের জাপটে ধরে টেনে নিয়ে যাচ্ছে অন্ধকারে।

পনেরো মিনিটের মধ্যে গোটা স্টেডিয়াম ঘন অন্ধকারে ডুবে গেল। শ্মশানের রূপ নিল স্টেডিয়াম। চতুর্দিকে শুধু আর্তনাদের গোঙানি শোনা যাচ্ছে। কোথাও কোথাও নিভে যাওয়া আগুন ধিকধিক করে জ্বলছে। কোথাও কোথাও টর্চের আলো চাবুকের মতন অন্ধকারকে শাসাচ্ছে। দিশেহারা মানুষ, পুলিশ ও নিরাপত্তারক্ষীরা যে-যার নিজেকে সামলাতে ব্যস্ত। শুধুমাত্র ভি. আই. পি. এনক্লোজারে মাউন্টেড পুলিশের ব্যারিকেড কেউ ভাঙতে পারেনি।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যে অসংখ্য পুলিশ ভ্যানে ছেয়ে গেল গোটা অঞ্চল। এমার্জেন্সি সার্চলাইট হাতে পুলিশ উদ্ধারকার্য শুরু করল। দু ঘণ্টা পরে আমি হিয়া আর পিয়াকে সঙ্গে নিয়ে কালু মিঞার খোঁজে বেরুলাম। কালুও আমাদের খুঁজছিল। দেখা হয়ে গেল। সেখান থেকে হাঁটতে হাঁটতে আমাদের আসতে হল টালিগঞ্জ থানা পর্যন্ত। কালু গাড়ি নিয়ে পালিয়ে এসেছে এখানে। সোজা বাড়ি ফিরে এলাম।

বুলু কোথায় বেপাত্তা হয়ে গেল ভেবে পাচ্ছি না। ইভিনাকে ফোন করলাম। নো রিপ্লাই। নন্দিতাকে ফোন করে জানলাম, ওর পৌঁছতে একটু দেরি হয়েছিল। তখন তুলকালাম শুরু হয়ে গিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে ও ফিরে গিয়েছে।

পরের দিন কাগজে প্রথম পাতায় তিন কলম জুড়ে খবর বেরুল। সঙ্গে ভগ্নস্তূপের ছবি। কয়েক হাজার চপ্পল, ছেঁড়া শাড়ি ব্লাউস ব্রেসিয়ার, ওড়না, জলের বোতল, খাবারের প্যাকেট ছড়িয়ে রয়েছে সারা স্টেডিয়ামে।

দুটো হকি স্টিক পাওয়া গিয়েছে। কেরোসিনের খালি টিন পাওয়া গিয়েছে কয়েকটি। পুলিশের ধারণা, এটা স্যাবোটাজ। মাইক কর্তৃপক্ষ কবুল করেছে, তাদের পনেরো মিনিট মাইক বন্ধ রাখতে বলা হয়েছিল। বুলু ও তার সাগরেদদের পুলিশ খুঁজছে।

গ্র্যান্ড হোটেলে আশ্রিত শিল্পীরা সাংবাদিকদের জানিয়েছে, তারা বকেয়া টাকা পায়নি। স্টেডিয়ামে নিয়ে যাবার জন্য কেউ আসেনি তাদের কাছে। হোটেল কর্তৃপক্ষ পুরো টাকা পায়নি। গোটা ঘটনার জন্য পুলিশ বুলুকে দায়ী করেছে। বুলু বেপাত্তা। সরকারি নির্দেশ জারি হয়েছে, তদন্ত কমিশন গঠন করে পুরো ঘটনার রিপোর্ট পেশ করতে হবে।

কাগজ পড়তে পড়তেই বুলুর ফোন পেলাম। ইভিনার ফ্ল্যাট থেকে ফোন করছে। আধ ঘণ্টা কথা হল বুলুর সঙ্গে। ওর কথা শুনে আমার চোখের সামনে একটা ছবি ফুটে উঠল।

গতকাল বেলা এগারোটার সময় চেতলায় এক বুকমেকারের অফিসে বসে আছে বুলু। সঙ্গে অ্যাটাচি ভর্তি এগারো লক্ষ টাকা। দুপুর দেড়টায় প্রথম ক্যালকাটা রেসে রেমেডিয়াস ও লেস্টার পিগট রাইড করবে। রেমেডিয়াসের ঘোড়া টপ ফেভারিট। লেস্টার পিগট যে ঘোড়াটা চালাবে, তার পারফরম্যান্স ইদানিং ভাল নয়। অতএব নিঃসন্দেহে ধরে নেওয়া যায় রেমেডিয়াসের উইন কেউ ঠেকাতে পারবে না। বুলুকে বুকমেকার জানিয়েছে, রেমেডিয়াসের ঘোড়ার দর আশি পয়সার বেশি হবে না। সে জায়গায় লেস্টারের ঘোড়ার দর হবে ফাইভ টু ওয়ান। অতএব বুলু নিশ্চিন্তে দশ লাখ টাকাটা আঠারো লাখ বানাতে পারে। টাকাটা দেবে বেলা একটার পর আর পৌনে দুটোয় সেটা বেড়ে ওর হাতে চলে আসবে।

এরপর ছবি ফুটে উঠছে রেসকোর্সের। বুকমেকারের ঘরে বুলু টাকা জমা করে দিয়েছে। বেলা একটা পনেরো মিনিটে প্যাডকে ঘোড়াদের প্রদর্শন হয়ে গেল। সবাই এক বাক্যে নিশ্চিত, রেমেডিয়াসকে কেউ ঠেকাতে পারবে না। অন্তত ছ-সাত লেংথে রেমেডিয়াস উইন করবেই। জকিরা ঘোড়াদের স্টার্টিং পয়েন্টের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। বারোশো মিটারের দৌড়।

ক্লোজ সার্কিট টিভি-তে দেখা যাচ্ছে খাঁচায় ঢোকবার আগে ঘোড়াগুলো পাক খাচ্ছে। দু নম্বর লেনে লেস্টার পিগট তার ঘোড়া নিয়ে ঢুকে গেল। পাঁচ নম্বর লেনে রেমেডিয়াস। কাঁটায় কাঁটায় দেড়টায় ফ্ল্যাগ নেমে গেল। দৌড় শুরু হল। ফার্স্ট বেন্ডে রেমেডিয়াস এক নম্বরে। লেস্টার চার নম্বরে। বেন্ড ক্রশ করার সঙ্গে সঙ্গে লেস্টারের ঘোড়া উল্কার মতন ছিটকে দুটো ঘোড়াকে টপকে এলো। সেকেন্ড বেন্ডে লেস্টার রেমেডিয়াসের চেয়ে দু লেংথে পিছিয়ে। ডিসট্যান্ট পোস্ট পেরুনোর সঙ্গে সঙ্গে লেস্টারের ঘোড়াকে মনে হল জেট প্লেন টেক-অফ করার মুহূর্তে। লেস্টারের ঘোড়া যখন উইনিং পোস্ট পেরুল তখন রেমেডিয়াস ছ লেংথ পিছিয়ে।

এই অবিশ্বাস্য রেস বিশ্বের অনেকগুলো রেসের রেকর্ড ভেঙে দিল। যে-ঘোড়ার ফর্ম নষ্ট হয়ে গিয়েছে, বর্তমান মরশুমে অন্তত দশবার উইন পাওয়া ঘোড়াকে সে ছ লেংথে হারিয়ে উইন পেয়ে গেল! নির্দ্বিধায় সবাই স্বীকার করল, বিশ্বের এক নম্বর জকি লেস্টার পিগট। সে গাধাকেও ঘোড়া তৈরি করে দিতে পারে। এই অসাধারণ সুনিপুণ দক্ষতার জন্য লেস্টার পিগট রেসিং ওয়ার্ল্ডে অমর হয়ে থাকবে।

লেস্টার তো অমর হল। এদিকে মাঠে তো হাহাকার অবস্থা। ইন্টার স্টেট বেটিং অপারেশনে কোটি কোটি টাকা ঢুকে গেল বুকমেকারের গর্ভে। বহু পান্টার দেউলিয়া হয়ে গেল। বুলুর চোখ ফেটে রক্ত বেরুবার উপক্রম। ওর সঙ্গে দুজন সাগরেদ ছিল। মাঠ থেকে বেরিয়ে ওরা সোজা চলে গেল পার্ক স্ট্রীটের একটি পানশালায়। সেখানে বসেই প্ল্যান হল, কীভাবে অনুষ্ঠানটি ভেস্তে দেওয়া যায়। সাগরেদ দুজন পুরো টীম নিয়ে ছক করে ফেলল, কীভাবে অপারেশন শুরু হবে। বুলুর টীমের মাস্তান ও সমাজবিরোধীরা নিপুণ হাতে তাদের কেরামতি ও যোগ্যতা প্রমাণ করেছে।

ঠিক ছিল, রেসকোর্স থেকে বেরিয়ে বুলু ইভিনাকে তুলবে। পার্ক স্ট্রীটের পানশালা থেকে বেরিয়ে ও ইভিনার ফ্ল্যাটে গিয়ে ওঠে। সেখান থেকে আমাকে ফোন করে গ্র্যান্ডে। লালবাজারের গল্প ফেঁদে ও আমাকে

পাঠিয়ে দেয় স্টেডিয়ামে। লাক্সারি কোচে দিলীপকুমারকে নিয়ে যেতে বলে—কারণটা তো পরিষ্কার। সবাই ধরে নিয়েছিল সব শিল্পীরাই স্টেডিয়ামে এসে গিয়েছে। বুলু জানিয়েছে, কিছু পুলিশকে নোট ধরিয়ে হাত করেছিল ওর লোক।

সব শোনার পরে ওকে জিজ্ঞেস করলাম, 'কাল রাতে কোথায় ছিলি? ইভিনার ফ্ল্যাটে ফোন করে নো রিপ্লাই পেয়েছি।'

ও বলল, 'কাল বিকেল থেকে ইভিনার ফ্ল্যাটেই লুকিয়ে আছি। কোথাও বেরুইনি। অনেক ফোন এসেছে। আমরা ধরছি না।'

জিজ্ঞেস করলাম, 'তদন্ত কমিশন বসছে। সামাল দিবি কিভাবে?'

ওর সাফ জবাব, 'টাকা—টাকা দিয়ে সামাল দেব।'

আমার টাকাটা বুলুর কাছ থেকে ফেরৎ পেয়ে গিয়েছিলাম বলে বেঁচে গিয়েছি। তা না হলে ওটাও ঢুকে যেত বুকমেকারের গর্ভে। কিন্তু পরের সপ্তাহে আবার আপসেট রেস হল। দ্বিতীয় রেসে চেন্নাস্বামীর টপ ফেভারিট ঘোড়া 'প্রাইম প্রিন্স' কোনও প্লেসে এলো না। উইনের দর ছিল চল্লিশ পয়সা। জকি ছিল সুদক্ষ আসলাম জাভেদ। পয়সাওয়ালা পান্টাররা এক-একজন লক্ষ লক্ষ টাকা লাগিয়ে দিল, কিন্তু ঘোড়া গাধার মতন আচরণ করল।

চতুর্থ রেসে চেন্নাস্বামীর আর-একটি ফেভারিট ঘোড়ার রাইডার হল আসলাম। প্যাডকে পান্টাররা কাঁচা খিস্তি দিল আসলামকে। মা-মাসি তুলে তার চোদ্দ পুরুষ উদ্ধার করল সকলে। আসলাম নির্বিকার। পাথরের মূর্তির মতো বসে এগিয়ে গেল ঘোড়ার পিঠে। এবারের ঘোড়াও টপ ফেভারিট—'গোল্ড স্পার্ক'। দর উঠল পঞ্চাশ পয়সা। হাইয়েস্ট পুল হল 'গোল্ড স্পার্ক'-এ। সকলেই ধরে নিল, আগের রেসে চেন্নাস্বামীর ঘোড়া যেহেতু হেরেছে—এই রেসে 'গোল্ড স্পার্ক' অবধারিত জিতবেই। স্বভাবতই প্লেসে এই ঘোড়ার কোনও দরই ছিল না। কিন্তু 'গোল্ড স্পার্ক' থার্ড হয়ে গেল।

ছ'নম্বর রেসে আবার চেন্নাস্বামীর একটি ঘোড়ায় চেপে বসল আসলাম জাভেদ। এবার আর গালিগালাজ নয়—সরাসরি ইট খেল আসলাম। তড়িঘড়ি সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হল আসলামকে। ওর বদলে অন্য জকি চাপল সেই ঘোড়ায়। কিন্তু গোড়ার দর উঠল না। পাঁচের দর দিল বুক মেকাররা। যথারীতি পুল খুব খারাপ। শেষ মুহূর্তে ছ-এর দর উঠল। কিন্তু সেই ঘোড়াকে পান্টাররা কোনও পাত্তাই দিল না। কিন্তু ফটো ফিনিশে সেই ঘোড়া উইন করে গেল। এর ফলে সকলেই ধরে নিল, আসলাম 'প্রাইম প্রিন্স' এবং 'গোল্ড স্পার্ক'-কে টেনে দিয়েছে। এই ইচ্ছাকৃত হারের জন্য সবাই তুলোধনা করতে লাগল আসলামকে। সামনে পেলে পান্টাররা তার টুঁটি ছিড়ে ফেলত।

পরের সপ্তাহের রেস-বুকে দেখা গেল, আসলাম জাভেদ চেন্নাস্বামীর দুটো ঘোড়ায় রাইডার। দ্বিতীয় ও চতুর্থ রেসে। ঘোড়া দুটোও ফেভারিট। যে-কোনও কারণেই হোক, গত সপ্তাহে ঘোড়া টেনে দেবার নির্দেশ ছিল আসলামের ওপর। হয়তো চেন্নাস্বামী নিজেই চেয়েছিলেন, তাঁর ঘোড়া হারুক। বুকমেকারদের যোগসাজশে ঘোড়ার মালিকরা এরকম নির্দেশ দিতে পারে জকিদের। এক্ষেত্রে বুকিদের কাছ থেকে মোটা টাকার হিস্‌সা পায় মালিকরা। কিন্তু সব সময় তো তা হতে পারে না। সেক্ষেত্রে ফেভারিট ঘোড়ার কদর ক্রমশ কমে যাবে এবং দক্ষ জকিও অপ্রিয় হয়ে উঠবে পান্টারদের কাছে।

অতএব এ-সপ্তাহের দ্বিতীয় রেসে প্যাডকে আসলাম জাভেদকে অপদস্ত করল না কেউ। শুধু কিছু আওয়াজ দিল। যেমন—এবার যেন আবার ডুবিও না আসলাম ভাই। বা, তোর বাবা এবার কী বলেছে রে? গালিগালাজ করল না কেউ। যাই হোক, ঘোড়ার দর দিল পঞ্চাশ পয়সা। ছোটখাট পান্টাররা পাঁচশো থেকে পাঁচ হাজার টাকা খেলে দিল। বিত্তবানরা খেলল পঞ্চাশ হাজার থেকে এক লাখ। ছ'টি ঘোড়া দৌড়বে। চোদ্দশো মিটারের রেস। ঘোড়াগুলো প্যাডক ছেড়ে স্টার্টিং পয়েন্টের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। যথাসময়ে ঘোড়াগুলো খাঁচায় ঢুকে পড়ল। আসলাম চেপেছে ছ'নম্বর

ঘোড়ায়—নাম 'অ্যামেজিং ডরোথি'। অসাধারণ দক্ষ ঘোড়া হিসেবে 'অ্যামেজিং ডরোথি'-র নাম আছে।

রেস শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে কমেন্টেটরের গলায় শোনা গেল, আসলাম পড়ে গিয়েছে ঘোড়ার পিঠ থেকে। গ্যালারিতে খিস্তির ঝড় উঠল। বেঞ্চির ওপর দাঁড়িয়ে অনেকে লাফাতে শুরু করল। চেঁচামেচি আর খিস্তি-খেউড়ে 'রণং দেহি' অবস্থা পান্টারদের। দেখা গেল, জকিহীন 'অ্যামেজিং ডরোথি' শুরু থেকে পাঁচটা ঘোড়াকে টপকে প্রথম স্থান ধরে এগিয়ে আসছে। ডিসট্যান্ট পোস্ট পেরিয়ে 'অ্যামেজিং ডরোথি' নিজে থেকেই গতি আরও বাড়িয়ে দিল। তার পিছনে দু নম্বর আর তিন নম্বর ঘোড়ার মধ্যে রেষারেষি চলছে। 'অ্যামেজিং ডরোথি' তিন লেংথে লিড নিয়ে উইনিং পোস্ট পেরিয়ে গেল। তার পিছনে দু নম্বর ঘোড়া এক লেংথে তিন নম্বরকে হারিয়ে উইনিং পোস্ট পেরুল। ফলাফল ঘোষণা করা হল—দু নম্বর প্রথম, তিন নম্বর দ্বিতীয়। এই রেসে তৃতীয়র কোনও প্লেস ছিল না। মাঠে তীব্র আস্ফালন শুরু হয়ে গেল। সকলের দাবি—এই রেস ক্যানসেল করতে হবে। স্টুয়ার্ডের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করল পান্টাররা। মাইকে ঘোষণা ভেসে এলো—এই রেসের ব্যাপারে পুনর্বিবেচনা করা হচ্ছে।

একটু পরেই একটা অ্যাম্বাসাডর গাড়ির পিছনে একটা অ্যাম্বুলেন্স বেরিয়ে গেল সকলের চোখের সামনে দিয়ে। আবার খিস্তির ঝড় উঠল আসলামকে কেন্দ্র করে। তিন মিনিট পরে মাইকে ঘোষণা : ঘোষিত ফলাফলই চূড়ান্ত। 'অ্যামেজিং ডরোথি' ডিসকোয়ালিফায়েড। এক্ষেত্রে নিয়ম অনুযায়ী সঠিক ফলাফলই ঘোষণা করা হয়েছে।

মাঠে আগুন জ্বলার উপক্রম হল। বেশ কিছু লোক ক্লাব হাউসের সংরক্ষিত এলাকার বাইরে বিক্ষোভে ফেটে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে মাউন্টেড পুলিশের আবির্ভাব ঘটতে সবাই সরে গেল। পরের রেস শুরু হল দশ মিনিট দেরিতে।

চতুর্থ রেসে চেন্নাস্বামীর ঘোড়া জিতে গেল। দর ছিল ইভ্‌ন্ মানি। জকি এম রজ্জাক দক্ষতার সঙ্গে জেতাল চেন্নাস্বামীর ঘোড়া। সবাই ধরে নিল আসলাম জাভেদ ইচ্ছে করেই ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়েছে।

চেন্নাস্বামীর বেডরুমে ওর সুন্দরী বউয়ের সারা শরীরে রোমকূপের গন্ধ শুঁকছে আসলাম জাভেদ

পরের দিন কাগজে বেরুল—আহত অবস্থায় আসলাম জাভেদ একটি নার্সিংহোমে ভর্তি হয়েছে, যদিও তার ঘোড়া 'অ্যামেজিং ডরোথি' জকিহীন অবস্থায় সবাইকে টপকে উইনিং পোস্ট পেরিয়ে যায়। সেদিন সন্ধ্যায় ব্যাঙ্গালোর টার্ফ নিউজে দেখলাম, পরের দিন আসলাম সেখানে দুটো ঘোড়ায় রাইড করছে। সেটা কীভাবে সম্ভব হবে! আসলাম তো নার্সিংহোমে! তাহলে তো আজই ওর ব্যাঙ্গালোরে উড়ে যাবার কথা। ধরে নিলাম, আসলামের বদলে অন্য কোনও জকি রাইড করবে।

আশ্চর্য হয়ে গেলাম—পরের দিন আসলাম রাইড করল ব্যাঙ্গালোরে। তার মানে, আগের দিন আসলাম উড়ে গিয়েছে ব্যাঙ্গালোরে। যদি সত্যিই সে আহত হয়ে থাকে তাহলে পরের দিন সে কী করে রাইড করে! তার মানে, গোটা ব্যাপারটাই সাজানো। ব্যাঙ্গালোরে রাজেশ খৈতানের দুটো ঘোড়ায় রাইড করে আসলাম। একটায় উইন পেল, আর একটায় থার্ড। এবার আর কোনও সন্দেহ রইলো না—কলকাতায় পর পর দুটো সপ্তাহে আসলাম গট-আপ করেছে।

কয়েকদিন পরে কাগজে দেখলাম—আসলাম জাভেদকে ছ'মাসের জন্য সাসপেন্ড করা হয়েছে চেন্নাস্বামীর অভিযোগের ভিত্তিতে। তাহলে? চেন্নাস্বামীর নির্দেশে আসলাম গট-আপ করেনি! তাহলে এই গট-আপ রেসের পেছনে নাটের গুরু কে? কার নির্দেশে বা আদেশে আসলাম পরপর দু-সপ্তাহ কলকাতাকে ডোবাল? শুধু কলকাতাই-বা কেন, ইন্টার স্টেট বেটিং অপারেশনে ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যের পান্টাররাও তো ভরাডুবি হয়েছে। সব মিলিয়ে কোটি কোটি টাকার খেলা খেলেছে আসলাম জাভেদ।

কৌতূহল চাপতে না পেরে এজেন্টের অফিসে দাস সাহেবকে ফোন করলাম। প্রথমেই দাস সাহেব আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনলেন, 'সিন্‌হা সাহেব, অনেকদিন আপনার সঙ্গে যোগাযোগ নেই কেন? আমরা কি কোনও অপরাধ করেছি?'

আমি সবিনয়ে বললাম, 'আরে না না, একথা বলে আমাকে লজ্জা দেবেন না। আসলে ছোটখাট ঝামেলায় ব্যস্ত ছিলাম।'

দাস সাহেব জিজ্ঞেস করলেন, 'রেস ছেড়ে দিয়েছেন নাকি? অনেকদিন যোগাযোগ না থাকায় ভাবলাম—'

'আরে না না, রেস ছাড়ব কেন! ঘোড়া তো আমার রক্তের সঙ্গে মিশে গিয়েছে। এই তো রিসেন্টলি আসলাম জাভেদ-এর মোস্ট ফেভারিট ঘোড়ায় মার খেলাম লাখ খানেক টাকা। এটা কী মশাই? এতটা গট-আপ রেসও সম্ভব? আর যদি গট-আপ-ই হয়—তাহলে চেন্নাস্বামী ওকে সাসপেন্ড করাল কেন। এটাও কি লোক দেখানো ব্যাপার?'

দাস সাহেব বললেন, 'দেখুন, সাধারণত এই ধরনের আপসেট রেস মাফিয়ারা কনট্রোল করে। ধরুন, আগামীকাল ক্যালকাটা বম্বে বা ব্যাঙ্গালোরে যে-কোনও জায়গায় প্রথম শ্রেণীর ফেভারিট ঘোড়া দৌড়বে, এবং ফেভারিট ঘোড়ার জকিও অত্যন্ত দক্ষ। রেসের দিন সকালে সব কটি ঘোড়ার মালিক ফোন পেলো—অমুক নম্বর রেসে অমুক নম্বর ঘোড়াকে যেন জেতানো হয়। এর অন্যথা হলে সপরিবারে প্রাণ হারাবে। যে-ঘোড়াটাকে জেতানোর নির্দেশ এলো, সে-ঘোড়াটা কোনও প্লেসেই আসার কথা নয়। স্বভাবতই তার দর থাকবে সবচেয়ে বেশি। সেই ঘোড়ায় 'মাফিয়া-কিং' মোটা টাকা লাগিয়ে দেয়। এরপরে ফোন যাবে একটি নামকরা বুকমেকারের ঘরে। সেখানে নির্দেশ এলো—অমুক নম্বর রেসে অমুক নম্বর ঘোড়া জিতবে। সেই ঘোড়ায় 'মাফিয়া-কিং' এতো টাকার বাজি ধরবে। ব্যাপারটা যেন জানাজানি না হয়। জানাজানি হলে সপরিবারে প্রাণ হারাতে হবে।

'ঘোড়ার মালিকরা সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের মধ্যে বোঝাপড়া করে জকিদের নির্দেশ দিয়ে দেয়—কোনওক্রমে যেন তাদের ঘোড়া উইন না পায়। যে ঘোড়াটা জিতবে, তার মালিক জকিকে জানিয়ে দেয়—সবকটা জকিই ঘোড়া টেনে তাকে এগিয়ে দেবে। অতএব সে যেন প্রথম থেকেই রেলিং ধরে তৎপরতার সঙ্গে উইনিং পোস্টের লক্ষ্যে এগিয়ে যায়।

'এই ধরনের আপসেট রেস করিয়ে মাফিয়ারা মোটা টাকা কামিয়ে নেয়। একবার এই ধরনের একটা গট-আপ রেসের রেজাল্ট উল্টে গিয়েছিল। জকিদের যথাযথ নির্দেশ দেওয়া সত্ত্বেও যে-ঘোড়াটাকে জেতানোর কথা

ছিল সেটা সেকেন্ড হয়ে যায়। তার কারণ—যে ঘোড়াটা উইন করেছিল তার পারফরম্যান্স এতোটাই সুনিপুণ ছিল যে, শত চেষ্টা করেও জকি তাকে টেনে রাখতে পারেনি। মাফিয়ারা সেই ঘোড়ার জকিকে গুলি করেছিল। কিন্তু গুলিটা তার বাঁ হাতের কব্জির কাছে লেগেছিল। সে প্রাণে মরেনি। ছ'মাস চিকিৎসা করিয়ে সে পুনরায় ফিরে আসে রাইড করতে। কিন্তু আগের সেই দক্ষতা সে আর ফিরে পায়নি।'

'জকিকে গুলি করার পর মাফিয়া-কিং ফোন করেছিল উইন করা ঘোড়ার মালিককে। কৈফিয়ৎ চেয়েছিল, কি কারণে তার ঘোড়াকে জেতানো হয়েছে। ঘোড়ার মালিক স্বীকার করেছিল, তার সবকটি ঘোড়াকে ডোপিং করানো হয়। লন্ডন থেকে ড্রাগ আসত। ইন্টারভেনাস ইঞ্জেকশন দিয়ে ঘোড়াগুলোকে ডোপ করানো হত। একটা নির্দিষ্ট সময়ের পর ঘোড়াকে পরীক্ষা করলে ডোপিং-এর কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না। কিন্তু ডোপিং-এর শক্তি অক্ষুণ্ণ থেকে যায় ঘোড়ার মধ্যে।

'সেদিন রেস শেষ হবার পর স্টুয়ার্ড উইন করা ঘোড়াটাকে পরীক্ষা করে। প্রথমত নাকের কাছে হাত পেতে প্রশ্বাসের উষ্ণতা যাচাই করে। অভিজ্ঞ স্টুয়ার্ডরা এই উষ্ণতা যাচাই করে আন্দাজ করতে পারে, ঘোড়াকে ডোপ করা হয়েছে কিনা। স্টুয়ার্ডের সন্দেহ হয়েছিল। তখন ঘোড়ার লালা, ঘাম ও পেচ্ছাপ পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয় হংকং ও লন্ডনে। দু জায়গা থেকে পরীক্ষা করানোর কারণ—নিশ্চিত হওয়া। রিপোর্টে ডোপিং-এর প্রমাণ পাওয়া গিয়েছিল।

'এই কারণেই জকি চেষ্টা করেও ঘোড়াকে টেনে রাখতে পারেনি। আসুরিক তেজস্ক্রিয়তায় ঘোড়া উইন করে। সেই ঘোড়ার ট্রেনারকে একবছরের জন্য সাসপেন্ড করা হয়। মালিককে বাধ্য হয়ে অন্য ট্রেনার নিযুক্ত করতে হয়।'

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'কিন্তু আসলাম জাভেদের ব্যাপারটা কী?'

দাস সাহেব ধীর শান্ত কণ্ঠে বললেন, 'এর পেছনে অন্য কারণ আছে।

বলব সব। আসলাম জাভেদ-এর সঙ্গে আলাপ করবেন নাকি? কিছুদিনের মধ্যেই কলকাতায় আসবে সে। সঙ্গে থাকবে পরমা।'

আমি বললাম, 'অফকোর্স। আসলাম-এর সঙ্গে আলাপ করতে খুবই আগ্রহী আমি। ওর সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে চাই। কিন্তু পরমা কে?'

দাস সাহেব বললেন, 'বলব মশাই, সব বলব। সব কিছু জানার পরে আপনার আগ্রহ আরও বেড়ে যাবে। আজ সন্ধ্যায় কি ফ্রি আছেন? তাহলে চলে আসুন আমাদের অফিসে।'

আমি বললাম, 'আজ হবে না। একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে। কাল ছটার পর চলে আসুন ক্যালকাটা সুইমিং ক্লাবে। একেবারে ডিনার খেয়ে ফিরবেন।'

দাস সাহেব খুশি হয়ে বললেন, 'খুব ভালো। এ কাহিনীর সঙ্গে মদ্যপানটা জমবে। কাল দেখা হচ্ছে।'

সি. এস. সি.-তে ছ'টার পরে পরেই এসে গেলেন দাস সাহেব। আমি ড্রিংক্স্-এর অর্ডার দিয়েই অধৈর্যের মতন বলে ফেললাম, 'নিন, শুরু করুন।'

দাস সাহেব একটা চোখ ছোট করে রসিকতা করলেন, 'মনে হচ্ছে, কোনও রহস্যের গন্ধ পেয়ে গেছেন। আগে চুমুক তো দিন। নারী-সুরা-ঘোড়ার মধ্যে অনেক রহস্য মশাই! ধৈর্য ধরে শুনুন।'

ড্রিংক্স্-এ চুমুক দিয়ে দাস সাহেব জিজ্ঞেস করলেন, 'বম্বের গ্ল্যামার কুইন ফিল্মস্টার জুলির কোনও ছবি দেখেছেন?'

আমি বললাম, 'তা দেখেছি বৈকি! দারুণ সেক্স-অ্যাপিলিং! কোন্ একটা জার্নালে জুলির ফটো সেসন দেখেছিলাম।'

দাস সাহেব কিঞ্চিৎ বিরক্ত হয়ে বললেন, 'দূর মশাই! আমি সে-কথা বলছি না। ওর কোনও মুভি দেখেননি?'

আমি বললাম, 'না। মুভি দেখার সময় কোথায়! তবে শুনেছি, নাচ আর অভিনয়—দুটোতেই দক্ষ। জুলির জন্য লক্ষ লক্ষ দর্শক দিওয়ানা।'

দাস সাহেব কটাক্ষ করে বললেন, 'শুধুই লক্ষ লক্ষ দর্শক? আরে মশাই, গোটা বলিউড দিওয়ানা এই জুলির জন্যে। এমন লোকও আছে—লাখ লাখ টাকা দিয়ে ওর সঙ্গে একটা রাত কাটাতে রাজি।'

আমি বললাম, 'তা হতে পারে। কিন্তু হঠাৎ জুলির প্রসঙ্গ নিয়ে এলেন কেন?'

দাস সাহেব বললেন, 'বলছি। আপনি কি জানেন, চেন্নাস্বামী একটা ছবি প্রোডিউস করছে বলিউডে?'

আমি জবাব দিলাম, 'কই, না তো!'

দাস সাহেব বললেন, 'তবে শুনুন, বড় বাজেটের ছবি তৈরি হচ্ছে চেন্নাস্বামীর টাকায়, আর সেই ছবির হিরোইন হল ওই জুলি। মন দিয়ে শুনুন। চেন্নাস্বামী ছবি প্রোডিউস করার সিদ্ধান্ত নিতে ওর বউ-এর সঙ্গে মন-কষাকষি শুরু হয়। যখন জানাজানি হল যে, জুলি ওই ছবির হিরোইন তখন দ্বন্দ্ব চরমে ওঠে। কিন্তু চেন্নাস্বামী তখন মরিয়া—ছবি করার জন্যে নয়—জুলিকে পাবার জন্যে।

'ছবির গান রেকর্ডিং, ইনডোর শ্যুটিং শুরু হল। চেন্নাস্বামীর সঙ্গে জুলির গোপন সম্পর্ক স্থাপিত হল আর ওর বউ জ্বলে-পুড়ে খাক হতে লাগল।

'চেন্নাস্বামীর বউকে দেখতে অসাধারণ সুন্দরী। গায়ের রঙ থেকে শুরু করে স্বাস্থ্যের দীপ্তি, রূপ-লাবণ্য—কোনও কিছুই জুলির থেকে কম নয়। তফাৎ একটাই—জুলির বয়সটা কম, তাই গ্ল্যামার অনেক বেশি। আর জুলির ছলাকলা, নাচ, অভিনয়, কটাক্ষ পুরুষদের রক্তে আগুন ধরিয়ে দেয়। সেই আগুনে চেন্নাস্বামী আর ওর বউ—দুজনেই পুড়তে শুরু করল।

'সমুদ্র-বক্ষে লাক্সারি জলযানের বন্ধ কেবিনে চেন্নাস্বামী যখন জুলির নগ্ন শরীর নিয়ে ব্যস্ত—সেই সময় চেন্নাস্বামীর বেডরুমে ওর সুন্দরী বউয়ের সারা শরীরে রোমকূপের গন্ধ শুঁকছে আসলাম জাভেদ। আসলামকে আপনি দেখেছেন—ছোটখাট মজবুত হাল্কা শরীর, কিন্তু রূপবান। চেন্নাস্বামীর বউয়ের প্রতি যে-কোনও পুরুষই আকর্ষণ বোধ করবে—

আসলামেরও নজর ছিল ওর বউয়ের প্রতি—কিন্তু মালিকের বউয়ের দিকে হাত বাড়াতে সাহস হয়নি এই দক্ষ জকিটির। মেয়েরা বোধহয় ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়র মাধ্যমে বুঝতে পারে—কোন্ পুরুষ নীরবে তাকে কামনা করে চলেছে। চেন্নাস্বামীর বউও বুঝতে কসুর করেনি যে, আসলাম তার প্রতি অনুরক্ত। তাই চেন্নাস্বামীর স্বেচ্ছাচারিতার উপযুক্ত জবাব হিসেবে ও আসলামকে বেছে নেয়। আসলামের দেহে নিজেকে সঁপে দিয়ে গায়ের জ্বালা মেটালো চেন্নাস্বামীর বউ।'

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনি এত সব জানলেন কী করে?'

দাস সাহেব বললেন, 'রেসের আপসেট খবর যারা পায়—তারা এসব খবর জানতে পারে। সব শুনলে আপনিও বুঝতে পারবেন—কীভাবে জানলাম।'

আমি বললাম, 'সরি ফর দ্য ইন্টারাপশন—আপনি বলে যান।'

দাস সাহেব বললেন, 'না না, সরি বলছেন কেন! কোনও প্রশ্ন জাগলেই নির্দ্বিধায় বলবেন। তারপর শুনুন—সুইজারল্যান্ডে চেন্নাস্বামীর ছবির আউটডোর শ্যুটিং-এর দিনক্ষণ ঠিক হয়ে গেল। আর চেন্নাস্বামীর বউয়ের সঙ্গে পরামর্শ করে আসলাম সরাসরি যোগাযোগ করল বুকমেকারদের সঙ্গে। চেন্নাস্বামীর ফেভারিট ঘোড়াদের হারিয়ে লক্ষ লক্ষ টাকায় রফা হল বুকমেকারদের সঙ্গে। আসলামের সঙ্গে আমার সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ঠ। এই প্রস্তাব শোনার পর আমি ওকে জিজ্ঞেস করেছিলাম—এর কারণ কী? তখনই ও আমাকে জুলি-চেন্নাস্বামীর ব্যাপারটা বলে। আমি আন্দাজে ঢিল ছুঁড়েছিলাম—তুমি কি পরমাকে পেয়ে গেছ? ও বলেছিল—চেন্নাস্বামী যখন সুইজারল্যান্ডে জুলির শরীরে স্কিয়িং করবে তখন পরমাকে নিয়ে আমি প্যারিসের নাইটক্লাবে কোমর জড়িয়ে নাচব। এবার বুঝতে পারছেন তো—পরমা হল চেন্নাস্বামীর বউ। বাঙালি মেয়ে। যেমন ডাকসাইটে সুন্দরী তেমনি জেদী।

'আসলামের প্রচুর টাকার দরকার ছিল। আর দরকার ছিল অবসর। কায়দা করে ও দুটোই পেয়ে গেল। তবে প্রথম দিন দুটো রেসের পর

ঢিল খাওয়ার জন্য তৃতীয় রেসে ও রাইড করেনি। চুক্তি অনুযায়ী তিনটে রেসেই ও ঘোড়া টেনে দেবে। কিন্তু থার্ড রেসে চেন্নাস্বামীর ঘোড়া জিতে যাওয়ায় দেনা-পাওনার বখরা বদলাতে বাধ্য। তখনই ঠিক হয়ে যায়, পরের সপ্তাহে প্রথম রাইডেই ও ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে যাবে। ওই রেসেই বুকিদের সব গর্ত বুজে যায়।'

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'আসলাম কবে আসছে?'

দাস সাহেব বললেন, 'সপ্তাহখানেক পরে। দু-একদিনের মধ্যেই চেন্নাস্বামী রওনা হবে। পরমাকে নিয়ে আসলাম কলকাতায় এসে তাজ বেঙ্গল-এ উঠবে। এখান থেকে বম্বে হয়ে প্যারিস চলে যাবে। ওই সময় তাজে আসলামের সঙ্গে আপনাকে পরিচয় করিয়ে দেব। যথারীতি পরমার সঙ্গেও আপনার আলাপ হয়ে যাবে।'

আমি বললাম, 'অশেষ ধন্যবাদ! সেই দিনটির অপেক্ষায় রইলাম।'

তাজ বেঙ্গল-এর সুইটে পরমাকে দেখে আমার চোখ ঝলসে গেল। জুলিকে আমি সামনা-সামনি দেখিনি। দেখলে তুলনা দিতে পারতাম, কে বেশি সুন্দরী। আসলামকে দেখেছি জকির বেশে। অনেকটা সার্কাসের ক্লাউনের মতোই। আজ ওকে দেখলাম ঝকঝকে স্যুট-টাই পরা অবস্থায়—খুবই আকর্ষণীয় লাগল ওকে।

আলাপের শুরুতেই আসলাম বলল, 'আপনার কথা শুনেছি দাসের কাছে। আমার ব্যাপারে অনেকের কৌতূহল আছে। আপনি আমার সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে চেয়েছেন। একটা শর্তে আপনার সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হতে পারে।'

আমি বললাম, 'শর্ত? কিসের শর্ত?'

আসলাম আমাকে অবাক করে দিয়ে বলল, 'বন্ধু বন্ধুকে তার টাকাটা ফেরৎ দেবে।'

আসলাম কী বলতে চাইছে, আমি ধরতে পারলাম না। জিজ্ঞেস করলাম, 'কিসের টাকা বলুন তো?'

আসলাম বলল, 'যে টাকাটা আপনি আমার ঘোড়ায় বাজি ধরেছিলেন।'

আমি বললাম, 'যাঃ, তা আবার হয় নাকি! রেসের মাঠে—'

'রেসের মাঠে—' আমার মুখ থেকে কথা ছিনিয়ে নিয়ে আসলাম বলল, 'আপনি কত টাকা হেরেছেন বা জিতেছেন, সেটা কথা নয়। ক্যালকাটার লাস্ট দুটো দিনে আমার ঘোড়ায় যে টাকাটা চোট খেয়েছেন, সেটা ফেরৎ দিতে পারলে আমি খুশি হব। কেননা, ভেতরকার সব খবরই আপনি পেয়েছেন দাসের কাছে। বন্ধু হয়ে বন্ধুর টাকা আমি হজম করতে পারব না। তাছাড়া ওই তিনটে রেসের জন্য দশ লাখ পেয়েছি।'

আমি বললাম, 'বন্ধুত্বের সঙ্গে টাকাটা না-জড়ানোই ভালো।'

আসলাম বলল, 'জড়াচ্ছি না তো! হাল্‌কা হতে চাইছি। আমার এই অনুরোধটা আপনি রাখবেন না?'

আসলামের শর্ত এখন বন্ধুত্বের দাবিতে পরিণত। আমি চট করে কোনও উত্তর না দেওয়ায় আসলাম উঠে এসে আমার দিকে হাতটা বাড়িয়ে দিল। আমিও হাত বাড়ালাম।

আসলামের বয়স যা-ই হোক, দেখে চল্লিশের বেশি মনে হয় না। দীর্ঘদিন ধরে আসলাম তার শরীরের ওজন সাতচল্লিশ কেজি-তে বেঁধে রেখেছে। ছিপছিপে মজবুত চেহারা, গায়ের রঙ কটা। বাচন ও ব্যবহারে সম্ভ্রান্ত।

পরমার সঙ্গে তখনও আনুষ্ঠানিক আলাপ হয়নি। যদিও আমরা পরস্পরকে ঘন ঘন দেখছিলাম। মেয়েদের চোখ দেখে বুঝতে পারি—আমার প্রতি আকৃষ্ট কিনা। পরমা ধরা পড়ে গিয়েছে আমার চোখে। দুজনেই দুজনের প্রতি অপ্রতিরোধ্য টান অনুভব করছি। আনুষ্ঠানিক আলাপের পর প্রথমে আমিই স্তাবকতা করে বললাম, 'দাস সাহেবের কাছে আপনার রূপের প্রশংসা শুনেছিলাম, কিন্তু আপনি যে সাক্ষাৎ অগ্নিশিখা—সেটা না দেখলে বিশ্বাস হত না।'

পরমার মুখে রক্তছটা। মুখ নামিয়ে আবার মুখ তুলল ও। বলল, 'আপনার প্রথম কথা শুনেই বুঝতে পারছি—মহিলাদের পাবার জন্যে আপনাকে তপস্যা করতে হয় না।'

কথাটা তাৎপর্যপূর্ণ—গূঢ় ইঙ্গিত আছে কথাটার মধ্যে। আসলাম এবং দাস সাহেবের সামনে আমি ইচ্ছে করেই অন্য প্রসঙ্গ টেনে আনলাম। বললাম, 'আপনাদের তিনজনকে আজ একসঙ্গে পেয়েছি। আপনাদের বৈচিত্র্যময় জীবন সম্পর্কে অনেক কথাই শুনি। আজকের সন্ধ্যাটা গল্পে গল্পে কাটানো যাক।'

আসলাম বলল, 'ছ মাস রাইড করব না। একটু গা ভাসানো দরকার। দাঁড়ান, আগে জলের ব্যবস্থা করি।'

জল বলতে স্কচ এলো। পানপর্ব শুরু হল। আসলাম বলল, 'আপনি বৈচিত্র্যের কথা বলছিলেন—ওটা তো প্রত্যেকের জীবনেই কম-বেশি আছে। কারো প্রচার আছে, কারোটা গোপন থেকে যায়।'

আমি বললাম, 'আপনাদের জীবনের সঙ্গে গ্যাম্বলিং আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে আছে, তাই আপনাদের নিয়ে গুঞ্জনটাও বেশি।'

আসলাম বলল, 'গ্যাম্বলিং কোথায় নেই মশাই? প্রত্যেকটি সাধারণ মানুষের জীবনেও গ্যাম্বলিং জড়িয়ে আছে। রেসের মাঠের ব্যাপারটা একটু প্রকট। রেসের মাঠ শুনলেই অনেকে চমকে ওঠে—আবহমানকাল থেকে একটা সংস্কার তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। কিন্তু মানুষ নিজের দিকে তাকালে বুঝতে পারবে—সমাজের প্রত্যেকটি স্তরে তারা গ্যাম্বলিং-এর শিকার।'

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'কী রকম?'

আসলাম বলল, 'তাসের জুয়া বা সাট্টার সঙ্গে কোটি কোটি সাধারণ মানুষ জড়িত। অলি-গলিতে দেখবেন 'লাক-টেস' করার চাকা ঘুরছে। চাকার ঘরে পয়সা রাখছে ছেলে থেকে বুড়ো পর্যন্ত। পাঁচ-ছ বছর বয়েস থেকেই বাচ্চারা চাকার ঘরে পয়সা রাখছে। একজন হয়তো একটা সাবান বা বিস্কুটের প্যাকেট অথবা সোনার জলে ডোবানো একটা চেন পেল—বাকিদের পয়সা ভ্যানিশ! অথবা 'পয়সা ডবল' করো। কাঁটা একটা ঘরেই

ভিড়বে। সেই ঘরের পয়সা ডবল হবে। বাকিরা আবার পয়সা ফেকো।'

আমি বললাম, 'আপনি ঠিকই বলেছেন। ছেলেবেলা থেকেই রক্তে গ্যাম্বলিং ঢুকে যাচ্ছে।'

আসলাম বলল, 'কারেক্ট। লটারির কথাই ভাবুন একবার। এখানে সরকারের অনুমোদন ও সমর্থন ষোলো আনা। কোটি কোটি সাধারণ মানুষ লটারির নেশায় বুঁদ হয়ে আছে। পাচ্ছে ক'জন?'

দাস সাহেব যোগ করলেন, 'বাচ্চাদের স্কুলে ভর্তি করানোর ব্যাপারটা ভেবেছেন একবার? ভর্তি হবে দুশো বাচ্চা। পঞ্চাশ টাকা করে ফর্ম বিক্রি হল পাঁচ হাজার। কিনল কারা? সাধারণ মানুষ। এটা গ্যাম্বলিং নয়? নামকরা স্কুলে ভর্তির জন্যে ডোনেশন দিতে হচ্ছে। ছাত্রর মেরিট না থাকলে কয়েক বছর পর থেকেই ফেল্ শুরু হয়ে গেল। পরপর দু বছর ফেল করলেই নামকরা স্কুল জোর করে ট্রান্সফার সার্টিফিকেট দিয়ে দেবে। তা না হলে স্কুলের বদনাম হবে। ডোনেশনের টাকাটা ঝাড় হয়ে গেল। এটা গ্যাম্বলিং নয়?'

আমি বললাম, 'অবশ্যই গ্যাম্বলিং। আমরা এতো গভীরভাবে কেউ ভাবি না।'

দাস সাহেব আবার বললেন, 'আরো আছে মশাই। হায়ার এজুকেশনের জন্যে বা চাকরির জন্যে অগ্রিম টাকা ঘুষ দিতে হয়। ঘুষ দেবার পরেও অ্যাডমিশন বা চাকরি হয় না। টাকা দেওয়া বা নেওয়ার কোনও প্রমাণ থাকে না। টাকাটা মাঠে মারা গেল। এটাও তো একধরনের গ্যাম্বলিং। স্কুলে বই পাঠ্য করানোর ব্যাপারেও অবধারিত গ্যাম্বলিং। হেডমাস্টার টাকা খেয়ে বুকলিস্টে বইয়ের নাম তুলল। লিস্ট বিতরণের সময় ছাত্র-ছাত্রীদের জানানো হল—অমুক অমুক বই এখন কিনবে না। পরে অমুক অমুক বইয়ের বদলে কোন্ কোন্ বই কেনা হবে, তা ব্ল্যাকবোর্ডে লিখে জানানো হবে। দু-তিন জায়গা থেকে একই সাবজেক্টের বই-এর জন্য টাকা খেয়ে প্রকাশকদের ঠকাচ্ছে মাস্টাররা। জিজ্ঞেস করলে বলবে—বুকলিস্ট দেখুন। কিন্তু বই বিক্রি হয় না। তাতে হেডমাস্টারের কাঁচকলাটি। আজকাল

আবার মদের বোতল, মেয়েমানুষও দিতে হয় এইসব মহান ব্যক্তিদের! তাহলে ভাবুন—গ্যাম্বলিং কোন্ স্তরে গিয়ে পৌঁছেছে।'

দাস সাহেব ও আসলামের কথাগুলো শুনে বুঝলাম—যুক্তি অকাট্য। সমস্ত স্তরের সাধারণ মানুষ অদৃশ্য গ্যাম্বলিং-এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে। বললাম, 'আপনাদের ভাবনার প্রশংসা করতে হয়।'

দাস সাহেব বললেন, 'বিয়ের জন্যে পণের টাকা বা যৌতুক দেওয়াটাও একটা বড় গ্যাম্বলিং। টাকা ও যৌতুক দিলেই কি মেয়েরা সুখী হয়? ওটা তো লাক। মেয়ে সুখী হবে কি হবে না—সেটা না জেনেই পণের টাকা বা যৌতুক দিতে হয়। দেখুন, কত বড় গ্যাম্বলিং এটা।

'একটা ঘটনা বলি। খুব বেশি দিনের ঘটনা নয়। গতবছর আমার এক জ্ঞাতি-ভাই মেয়ের বিয়ে দিল খুব ধুমধাম করে। খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে বিয়ের সম্বন্ধ করে। বর্ধিষ্ণু পরিবারের সম্ভ্রান্ত বংশ বলে দাবি করে পাত্র পক্ষ। তাদের আরও দাবি ছিল, বংশ মর্যাদার জন্যই যৌতুক নয়, সম্মান-পারিতোষিক হিসেবে পাত্রকে পাঁচ লক্ষ টাকা নগদ দিতে হবে। এছাড়া সোনাদানা বাদে অন্যান্য দান সামগ্রীর সঙ্গে একটা নতুন গাড়ি চেয়েছিল তারা।

'আমার জ্ঞাতি-ভাইয়ের টাকার অভাব ছিল না। বংশ মর্যাদাও উঁচু মানের। একমাত্র মেয়ে যথেষ্ট সুন্দরী ও শিক্ষিতা। পাত্রও পছন্দ করার মতন। রূপবান ও স্বাস্থ্যবান। কিন্তু তাদের দাবির কথা শুনে অনেকেই আপত্তি জানালো এই বিয়েতে। আমার জ্ঞাতি-ভাই এমনিতেই মোটা টাকার বাজেট করেছিল একমাত্র মেয়ের বিয়েতে। জেদ করে এবং অহঙ্কারে পাত্রপক্ষের সমস্ত দাবি মেনে নিয়ে মেয়ের বিয়ে দিয়ে দিল। তার উদ্দেশ্য ছিল একটাই— মেয়ে সুখী হোক।

'মেয়ে কিন্তু সুখী হয়নি। শ্বশুরবাড়ির অত্যাচারে জর্জরিত হয়েছিল সে। শ্বশুরবাড়িতে প্রকাশ্যেই তাকে বলা হয়েছিল, সে মরলে তার স্বামী আর একটা বিয়ে করতে পারবে। আবার লক্ষ লক্ষ টাকা যৌতুক হিসেবে পেতে পারে সে। মেয়ে ফিরে এসেছিল বাপের বাড়িতে। ব্যাপারটার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে না পেরে মেয়েকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে আবার পাঠানো

চেয়ারম্যানের স্বেচ্ছাচারিতার উপযুক্ত জবাব—
আসলামের দেহে নিজেকে সঁপে দিয়ে গায়ের জ্বালা মেটালো ওর বউ

হয় শ্বশুরবাড়িতে। শেষ পর্যন্ত গায়ে আগুন লাগিয়ে মেয়েটা আত্মহত্যা করল। মেয়ের মৃত্যু-সংবাদ পাবার সঙ্গে সঙ্গে সিভিয়ার হার্ট অ্যাটাক হয়ে মারা যায় আমার জ্ঞাতি-ভাই। সেরিব্রাল অ্যাটাক। দুমিনিটের মধ্যে প্রাণ হারায় সে। স্বীকার করেন তো— এটাও একটা গ্যাম্বলিং?'

আমি বললাম, 'অনস্বীকার্য। তবে, রেসের মাঠে গ্যাম্বলিংটা একটু অন্য রকমের। সব ফেভারিট ঘোড়াই যদি জিতত, তবে তো পান্টারদের কোনও চিন্তাই থাকত না। কুড়ি তিরিশ পয়সা দরের ঘোড়াও অনেক সময় প্লেসে আসে না।'

আসলাম বলল, 'ঠিক কথা। তার কারণ, রেসের মাঠে সব রেস ফেয়ার হয় না। সব রেস ফেয়ার হলে ঘোড়ার মালিক, বুকমেকার, ট্রেনার মায় জকি পর্যন্ত টাকা কামাবে কী করে! ধরুন, একটা আনফেভারিট ঘোড়ার দর উঠল দশ গুণ। সে-ঘোড়ায় কেউ টাকা লাগাবে না। ঠিক হল, সেই ঘোড়াকে জেতানো হবে। ব্যাপারটা ঠিক হয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে অন্য ঘোড়ার মালিক সেই ঘোড়ায় বাজি ধরল মোটা টাকার। এবং যথারীতি পেয়ে গেল দশ গুণ। পান্টারদের মাথায় হাত!

'একটা উদাহরণ দিই। একটা সিজনে 'রেড ককার্ড' ঘোড়াটি মাদ্রাজে অপরাজেয়। পরপর পাঁচটা রেসে উইন পেল। সেই ঘোড়াকে ব্যাঙ্গালোর ডারবি-র জন্য আনা হল ব্যাঙ্গালোরে। ওয়ার্ম আপ রেসে 'রেড ককার্ড' উইন পেল। ব্যাঙ্গালোর কোল্ট ট্রায়াল স্টেক্স্-এ সাত-আট লেংথে উইন পেল। ডারবিতে ম্যাক্সিমাম পুল হল 'রেড ককার্ড'-এর ওপর। স্পেশাল সিকিউরিটি ফোর্স সারা মাঠ ঘিরে রেখেছে ঘোড়ার নিরাপত্তার জন্যে। বুকিদের কাছে মোটা টাকা খেয়ে জকি সুইনবার্ন 'রেড ককার্ড'-কে টেনে দিল। ঘোড়া সেকেন্ড হয়ে গেল। যে-ঘোড়াটা ডারবি জিতল তার নাম 'কম্যাঞ্চি'। 'রেড ককার্ড' 'কম্যাঞ্চি'-কে একবার কুড়ি লেংথে হারিয়েছিল। সেই 'কম্যাঞ্চি' উইন করল—'রেড ককার্ড' সেকেন্ড! 'রেড ককার্ড' আর কোনওদিন উইন পায়নি। ওকে টেনে দেবার ফলে দৌড়-এর রিদ্‌ম্ নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। অবশেষে সেই ঘোড়াকে স্টাড-এ পাঠিয়ে দেওয়া হয়।'

হঠাৎ কথা বলল পরমা, 'ব্যাপারটা খুবই দুঃখজনক। 'রেড ককার্ড'-এর ভবিষ্যৎ অন্ধকার হয়ে গেল সুইনবার্ন-এর জন্য। আর-একটি হতভাগ্য ঘোড়ার কথা মনে পড়ে গেল। খুবই দুর্ভাগ্যজনক। জি. ভেঙ্কটেশ রাও-এর 'মাইকা এমপ্রেস' ট্র্যাকে নামলেই রেকর্ড করত। অস্ট্রেলিয়ান ব্রিডার ঘোড়াটাকে নিয়ে যেতে চেয়েছিল। একটা রেসে 'মাইকা এমপ্রেস' লাস্ট বেন্ডে পড়ে যায়। ফলে তার পা ভাঙে। এই দুর্ঘটনার পরেই 'মাইকা এমপ্রেস'-কে কপালে গুলি করে মেরে ফেলা হয়। ঘটনাটা ঘটে এই কলকাতাতেই। জি. ভেঙ্কটেশ রাও আর. সি. টি. সি.-র টোটে খেলা সমস্ত পান্টারদের টাকা ফেরৎ দিয়েছিলেন।'

কম-বেশি নেশা হয়েছিল আমাদের। দাস সাহেব উঠে পড়লেন। আমিও বিদায় নিতে চাইলে পরমা বলল, 'আমি যদি গান গাইতে পারতাম তাহলে রবিঠাকুরের একটা গান আপনাকে শোনাতে পারতাম।'

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'কোন্ গানটা বলুন তো?'

পরমা বলল, 'বলব না।'

আমার মনে হল, আসলামের সামনে বলতে চাইছে না। আমি বললাম, 'একটু হিন্ট দিন।'

লাজানো ব্রীড়ায় পরমা বলল, 'তাও দেওয়া যাবে না। আপনি আন্দাজ করে নিন।'

আমি বললাম, 'আন্দাজ অবশ্য করছি। তবে, আপনি যদি কথা রাখতে বলেন, কথা রাখব বৈকি!'

পরমা রাঙিয়ে গেল। বলল, 'ধরে ফেলেছেন। তবুও কি এখনই উঠবেন?'

পরমার সাহস দেখে আসলামের উপস্থিতিতেই আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, 'আপনি কি সত্যিই মিলন-পিয়াসী?'

পরমার জবাব, 'আপনি নন?'

আমি আসলামের দিকে তাকালাম। ও মিটিমিটি হাসছে। তার মানে, আমাদের কথার গতিবিধি সম্পর্কে ওর ধারণা পরিষ্কার। পরমাকে আমার চাইতে ও অনেক বেশি চেনে। অতএব পরমার চাওয়া-পাওয়া, মেজাজ-মর্জি, ব্যক্তিত্ব ও স্বভাব সম্পর্কে ও যথেষ্ট সচেতন। পরমার কাছে কোথায়

সমর্পণ করতে হবে, কখন তার দাসানুদাস হতে হবে, কখন তার শরীরের খিদে মেটাতে হবে—এ-সবই সম্ভবত নির্ভর করে পরমার মর্জির ওপরে। আমার একটা ভুল ভেঙে গেল—ভেবেছিলাম, আসলামের সামনে ও রবিঠাকুরের গানের কলি 'না যেও না/মিলন-পিয়াসী মোরা/কথা রাখো' বলতে চাইছিল না। আসলে পরমা আমাকে পরীক্ষা করছিল—গানটা আমি ধরতে পারি কিনা। দুজনের চাওয়া-পাওয়ার সুরটা একই তারে বাঁধা কিনা—সেটাই বুঝতে চাইছিল ও। এইসব ব্যাপার মাথায় রেখেই বললাম, 'কলুর বলদ সরষের খোলটা পেলেই খুশি। আপনার যদি তেলের দরকার হয়, আমি আপনার বলদ হতে রাজি।'

উত্তরটা শুনে পরমা হেসে গড়িয়ে পড়ল। উত্তরের মধ্যে যথেষ্ট স্তাবকতা তো ছিলই—সঙ্গে সঙ্গে এটাও বুঝিয়ে দিয়েছি—পরমার চরম সুখের জন্য পরিশ্রম করে নিজেকে সম্পূর্ণ নিংড়ে দিতে আমি প্রস্তুত। হাসতে হাসতেই পরমা বলল, 'কোনও পুরুষের কাছ থেকে কোনও নারী এরকম অকপট কথা শুনেছে কিনা আমার জানা নেই। আপনার কথা শুনে নারী হিসেবে আমার গর্ব হচ্ছে। এতটা সম্মান দেবার জন্য আমি আপনার কাছে সত্যিই কৃতজ্ঞ।'

আমি বললাম, 'কোনও নারীর কাছে হ্যাংলামি করাটা আমি পছন্দ করি না—তাদের যথাযথ মর্যাদা দেওয়াটাই কর্তব্য বলে আমি মনে করি।'

পরমা বলল, 'আপনার কথা শুনে একটা ব্যাপার উপলব্ধি করছি—আপনার জন্যে আমার শরীর-মনে প্রেমের জন্ম হচ্ছে। শরীরের সঙ্গে মন জড়ালে একটা আলাদা অনুভূতি জাগে। আজ কিন্তু আপনার ফেরা হচ্ছে না। আপনাকে প্রথমেই বলেছিলাম না—মহিলাদের পাবার জন্যে আপনাকে তপস্যা করতে হয় না। সেটা প্রমাণ করার জন্যেই আমি আপনার ওপর জোর খাটাব।'

আমি আবার আসলামের দিকে তাকালাম। অনেকক্ষণ পরে আসলাম কথা বলল, 'দেখুন সিন্‌হা সাহেব, যে-দেবী যে-ফুলে তুষ্ট পূজারীকে তো সেই ফুল যোগাড় করতে হবে।'

সঙ্গে সঙ্গে পরমা বলল, 'একটু ভুল হল। দেবী যে-পূজারীর কাছে পূজা চায়—পূজাটা তারই করা উচিত।'

আমি বললাম, 'ঠিক কথা। কিন্তু আজকের পূজারী তো প্রথম থেকেই আসলাম ভাই। ওর প্রতি কোনও অবিচার হোক, তা আমি চাই না।'

পরমা বলল, 'আপনারা আসার আগেই ও পুজো-আহ্নিক সেরে ফেলেছে। এখন ওর ছুটি। দেবী এখন আপনার পুজো নিতে প্রস্তুত।'

পরমার স্বরে আদেশের সুর। আসলামকে কেমন নিস্পৃহ দেখাচ্ছে। ওর প্রতি পরমার ব্যবহার প্রায় চাকর-বাকরের মতন। আসলামের কাছে নিজেকে অপরাধী মনে হচ্ছে আমার।

পরমা আসলামকে বলল, 'আসলাম, তুমি কী করবে? তুমি কি অন্য কোথাও—'

পরমা আসলামকে স্রেফ কেটে পড়তে বলছে। আসলাম হুকুমতামিল করে বলল, 'নো প্রবলেম, ম্যাডাম। এখন তো রাত বেশি হয়নি। আশেপাশে আমার অনেক ডেরা আছে। আমি যাচ্ছি। কাল সকালে এসে যাব। এনজয় ইয়োরসেলভ্‌স্। গুড নাইট।'

আমার সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে বলল, 'গুড লাক, চলি।'

আমি বললাম, 'থ্যাঙ্ক য়ু, গুড নাইট।'

আমার উপস্থিতিতে আসলামের পৌরুষ দারুণভাবে আহত হল। কিন্তু আমার কিছুই করার নেই। বরাবর এরকম অপ্রত্যাশিতভাবে হুট করে আমার কপালে মেয়েমানুষ জুটে যায়। নারী-সঙ্গর যথার্থ প্রত্যাশী আমি—কিন্তু সত্যিই তা পাবার জন্যে আমাকে তপস্যা করতে হয় না। যদিও মানসিক দিক দিয়ে আমি তেমন জড়িয়ে পড়ি না অথচ আমার সঙ্গিনীরা অল্পবিস্তর প্রেমের স্বাদ পায় আমার কথাবার্তায় ও ব্যবহারে। জোড়া বউ বাদে নন্দিতা সুজাতা পরমা—এমনকি ইভিনার মধ্যেও এই দুর্বলতার আভাস পেয়েছি আমি। তবে, একমাত্র নন্দিতার ব্যাপারে আমার অনুভূতি একটু আলাদা। মাঝে মাঝে ওর জন্যে বোধ হয় আমার হৃদয়ে রক্তক্ষরণ হয়।

আসলাম বেরিয়ে যেতেই পরমা কাছে এগিয়ে এসে আমার ডানহাতটা ওর মুঠোয় জড়িয়ে ধরে বলল, 'এখন থেকে আর আপনি-টাপনি নয়—দেখি, মাথা নামাও—'

দুহাতে সজোরে আমাকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেল ও। আমি আদরে সোহাগে ওর ঠোঁটে গালে গলায় কানে চুমু খেতে খেতে জিভ বোলাতে লাগলাম। দুটি শরীর পরস্পরকে কামনার তীব্র আকর্ষণে অস্থির করে তুলল। পরমা অসাধারণ সুন্দরী ও ঠাসা যৌবনের প্রতীক। দেহের খাঁজে খাঁজে ও বক্রতায় যৌনতার চাপা আগুন ঠিকরে বেরুচ্ছে। আমার দুই কান মাথা ও রগ ফেটে গরম হল্‌কা বেরুচ্ছে। দুজনে দুজনের অজ্ঞাতেই পরস্পরকে নগ্ন করেছি। পরমার হাতের মুঠোয় ধরা আমার ইস্পাত-কঠিন পুরুষাঙ্গ। ওর উদ্ধত নরম দুধ-সাদা জোড়া বুক আমার দু-হাতে পিষ্ট হচ্ছে, মুখ ঘষছি সেখানে।

বিছানায় যাওয়া আর হয়ে উঠল না। মেঝেয় বিছানো মোটা কার্পেটের ওপরেই ও আমাকে টেনে নিল বুকের ওপর। মাত্র দু মিনিটের মধ্যে আমি নিয়ন্ত্রণ হারালাম।

সারারাতে মোট পাঁচবার আমরা সঙ্গমে মিলিত হলাম—আরও তিনবার বিছানায়, একবার গরম শাওয়ারের নিচে। এর মধ্যে বিপরীত বিহার হয়েছে—শেষ দুবার পরমা 'লিউয়েনস্কি' পদ্ধতিতে আমার পুরুষাঙ্গ সঙ্গমের উপযুক্ত করে দিয়েছে।

সঙ্গমের ফাঁকে ফাঁকে পরমার সঙ্গে অনেক কথা হল। ইদানিং চেন্নাস্বামীর সঙ্গে ওর যৌন সম্পর্ক প্রায় বিচ্ছিন্ন। বার দশেক ও শুয়েছে আসলামের সঙ্গে। আমি ওর জীবনে তৃতীয় পুরুষ। ইতিপূর্বে শীর্ষসুখ কখনো পায়নি। আমার কাছেই ও জীবনে প্রথম সঙ্গমের আসল সুখসাগরের সন্ধান পেল।

আলো ফোটার আগে শেষবার মিলিত হয়ে নগ্ন অবস্থাতেই ঘুমিয়ে পড়ি আমরা। সাপের মতন আমাদের শরীর জড়ানো ছিল। সাড়ে আটটায়

প্রথম আমার ঘুম ভাঙে। পরমাকে জাগিয়ে দিলাম। ও আমার খোলা বুকে হাত বুলতে বুলতে বলল, 'এ জীবনে তুমি ছাড়া আর কোনও পুরুষের সঙ্গে শোব না।'

জিজ্ঞেস করলাম, 'কেন?'

ও বলল, 'কী লাভ! এই স্বর্গসুখের সন্ধান তো কেউ আমাকে দিতে পারেনি। শুধু শুধু শরীর খামছানোর হামলা সইব কেন! তুমি আমাকে যা দিয়েছ—এর কোনও প্রতিদান হয় না। কলুর বলদের সব তেলটুকু তারই পাওনা—এই উপলব্ধি হল তোমার কাছে। তুমি পারো বটে!'

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'আসলামের সঙ্গে তুমি ফ্রান্সে যাবে না?'

ও বলল, 'না। যেতাম—তোমার সঙ্গে দেখা না হলে।'

আমি বললাম, 'আমার সঙ্গে তোমার দেখা হওয়ার জন্যে আসলাম বেচারির আশাভঙ্গ হলে নিজেকে অপরাধী মনে হবে। তুমি ওর সঙ্গে প্যারিসে যাও।'

পরমা দৃঢ় জেদী স্বরে বলল, 'না। আমি ওর সঙ্গে যাব না। নারী-সঙ্গ কাকে বলে ও জানে না। মদ খেয়ে শুধুই ধাম্‌সা-ধাম্‌সি করে আর নিজেকে স্খালন করে। ওর কাছে আমি সুখ পাব না। বরং তুমি আমাকে নিয়ে কোথাও চলো। তোমাকে একদম ছাড়তে ইচ্ছে করছে না।'

আমি বললাম, 'দেখ, আসলাম আমার সঙ্গে বন্ধুর মতন আচরণ করেছে—ও বিনাবাক্যে আমার কাছে তোমাকে রেখে চলে গেল, কোনও অধিকার প্রয়োগের কথাও ভাবেনি। তুমি ওর সঙ্গে যাও—ফিরে এসে আমায় পাবে। তুমি ওর সঙ্গে গেলে আমি স্বচ্ছন্দ বোধ করব। এটা আমার অনুরোধ হিসেবে নাও তুমি।'

পরমা আমার খরখরে গালে গাল ঠেকিয়ে বলল, 'ঠিক আছে, তোমার কথা রাখব। কিন্তু সাতদিনের জন্যে ওর সঙ্গে দেশের মধ্যেই কোথাও কাটিয়ে আসব। বিদেশের লম্বা ট্যুরে ওর সঙ্গে থাকতে পারব না। তুমি তৈরি থাকবে—ফিরে এসেই তোমার সঙ্গে বাইরে কোথাও যাব।'

আমি বললাম, 'ঠিক আছে, তাই হবে।'

আসলাম আসার আগেই আমরা ধাতস্থ হয়ে নিলাম এবং আমি বিদায় নিলাম।

পরমার সঙ্গে আমার আর দেখা হয়নি। দাস সাহেবের কাছে আসলাম আমার জন্য এক লক্ষ টাকা রেখে গিয়েছিল। সঙ্গে ছিল একটা চিঠি। লিখেছে ইংরেজিতে। তার বাংলা তর্জমা করলে এই রকম দাঁড়ায়—

প্রিয় সিন্‌হা,

প্রথমেই তোমাকে বন্ধু হিসেবে মেনে নিয়েছি। যে শর্তের কথা বলেছিলাম—সেটা শর্ত নয়, বন্ধুত্বের দাবি হিসেবে মেনে নিও। দুই বন্ধু এক নারীতে উপগত হলে সেটা স্বাভাবিক ঘটনা বলেই আমি মনে করি। বিশেষ করে সেই নারী যদি তার বন্ধুকে কামনা করে।

পরমা আমার কাছে এক আশ্চর্য সম্পদ! তোমাকে ওর অসম্ভব ভালো লেগেছে—ওর কথায় সেটা বুঝতে পারি। আমরা দিন দশেকের জন্য গোয়া যাচ্ছি। কেন জানি না, পরমা বিদেশযাত্রার পরিকল্পনা বাতিল করতে চাইছে। কলকাতায় ফিরলে তোমার সঙ্গে দেখা হবে।

রেসের ব্যাপারে তোমাকে কিছু টিপ্‌স্‌ দিয়ে যাচ্ছি। টিপ্‌স্‌গুলো অবশ্য আমার নয়—ভি. এম. দালাল-এর। এই অংশটা তর্জমা না করে কোটেশনের মধ্যে ইংরেজিতেই দিচ্ছি।

"Betting at the race-course has long been legalised. Because the results are uncertain due to several factors over which one has no control, horse-racing has become quite a gamble. Yet, thousands take to racing because of the attraction of winning quick and easy money.

Generally, I have learnt most punters find it difficult to exercise restraint at the race-course. But those who follow horse-racing scientifically win more often.

Hence, unsurprisingly, a majority of these punters lose money. This is only due to their irrational approach. The best way to make money, I would suggest is to first stop losing it. Given below are some broad hints to make horse-racing both profitable and enjoyable.

1. **Take horse-racing very seriously :** To use an analogy, an enterprising businessman first makes a detailed study of the pros and cons in his field of interest. Likewise, a punter should not only know mere basics of racing, but he should make a thorough study of the finer aspects of the game.

A lot of punters I came across were not even aware of the simpler aspects like, for instance, the differences among an open class Division 1 and Division II or even between a promotee and demotee. Still, there are a lot of punters ignorant of the more intricate details, yet these come in hordes at the betting enclosures.

2. **Don't select the winner blindly :** Before you bet on a horse, find out for yourself whether that horse can win. Don't bet on a horse just because it has become a favourite.

Thousands of punters bet blindly on 'favourites' or on 'inside information' and 'morals' got from so-called 'reliables sources'. These definitely lost in the end.

3. **Fix a particular amount for betting:** Make it a point not to exceed this limit even in the most tempting circumstances. You will be able to keep cool in the face of losses.

4. **Select only one or two races for betting:** A huge number of punters do just the opposite. They bet in all the day's races and ultimately lose. One can't possibly find winners in all races.

5. **Stop if you are continuously losing :** It's no use fighting a streak of bad luck. If you have lost a few bets, it's best to abstain from betting for two to three race days. A few days off betting should bring back the confidence.

6. **Don't borrow money to bet :** No one has been successful with borrowed money. The psychological pressure won't allow you to think rationally.

A Few General Tips...

* Don't bet on a demotee or a promotee.

* Don't bet on an older horse in the company of three or four-year-olds.

* Don't bet on a horse which is not placed within five lengths in its last two outings.

* Don't bet on a horse which carries a penalty of more than 5-1/2 kg. above the weight the horse carried the last time out.

* Don't bet on a horse which carries 60 kg. or more weight."

With love and best wishes—

yours
Aslam Javed

পরমার অনুপস্থিতিতে আমি কেমন বিষণ্ণ হয়ে যাই। সুজাতার সংসর্গে নিজের শূন্যতা কাটাবার চেষ্টা করি। কিন্তু অসতর্কতার জন্য একদিন ধরা পড়ে গেলাম নন্দিতার কাছে।

আমার মনে হয়েছিল, নন্দিতা আমাদের সন্দেহ করে। সুজাতা এবং আমি জানতাম, আমরা কী করছি। মা ও মেয়ের সঙ্গে আমার সম্পর্কের কথা সুজাতা জানে, আমিও জানি। কিন্তু নন্দিতা জানে না, তার মায়ের সঙ্গে তার প্রেমিকের সম্পর্কের কথা। এক্ষেত্রে এই তিন চরিত্রের মধ্যে নন্দিতা দুজনের কাছেই প্রতারিত—সুজাতা এবং আমি নন্দিতার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছি।

সুজাতাকে চুম্বনরত অবস্থায় নন্দিতা আমাদের দেখে ফেলে। এক মুহূর্ত আর না দাঁড়িয়ে ও ফিরে যায়। ধরা পড়ে গিয়ে আত্মপক্ষ সমর্থনের কোনও প্রশ্নই ওঠে না। সেদিন রাতেই নন্দিতা ওর ফ্ল্যাটে মদের সঙ্গে একগাদা ঘুমের ওষুধ খেয়ে আত্মহত্যা করল। সুইসাইডাল নোটে লিখেছিল—'ভালোবাসার পরিণতি।'

এই মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সুজাতার সাথে আমার সম্পর্ক শেষ হল। রেসের মাঠে একদিনে পাঁচ লাখ টাকা হেরে গেলাম। সবসময় মনে হয়—দুহাত বাড়িয়ে নন্দিতা আমাকে ডাকছে। অতিরিক্ত মদ্যপান করে মৃত্যুর কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিলাম। পনেরো দিন বড় নার্সিংহোমে ইনটেনসিভ কেয়ারে থেকে বেঁচে যাই।

তখনও জানি না, পরমা বেঁচে নেই। পরে দাস সাহেবের কাছে শুনেছিলাম—গোয়ার সী-বীচে পরমা ও আসলামের মৃতদেহ পাওয়া গিয়েছিল। ওদের দুজনকে খুন করা হয়েছিল। খুনি ধরা পড়েনি। দাস সাহেবের ধারণা— সুইজারল্যান্ড থেকে নির্দেশ পাঠিয়ে চেন্নাস্বামী মাফিয়া লাগিয়ে ওদের খুন করিয়েছে। আক্ষেপ হল—চেন্নাস্বামী কেন জানতে পারল না, পরমার সঙ্গে আমিও এক রাতে পাঁচবার সঙ্গমে মিলিত হয়েছিলাম। তাহলে আমাকেও এই ধরাধাম থেকে সরিয়ে দিত চেন্নাস্বামী।

নন্দিতা সুজাতা পরমা—তিন নারী হারিয়ে গেল আমার জীবন থেকে।

জার্মান ইহুদি জে. সি. গলস্টোনের কথা মনে পড়ছে আমার। ভাগ্যের পরিহাসে একদিন তাকে চলে আসতে হয়েছিল ভারতবর্ষে—এই কলকাতায়। ছোটবেলায় নাৎসিদের অত্যাচারে বিত্তবান বাবা ও পরিবারের হাত ধরে পালিয়ে যেতে হয় ইজরায়েলে। সেখানেও মুসলিমদের সঙ্গে সংঘর্ষ বাধে। অবশেষে গলস্টোনের বাবা পাড়ি দেন ভারতবর্ষে। পারিবারিক ব্যবসা ছিল ঘোড়া। গলস্টোন পরিবারের প্রচুর ঘোড়া রেসের মাঠে দৌড়ত। বিখ্যাত ব্রিডার্স ও স্টাড ফার্মের মালিক ছিলেন সিনিয়র গলস্টোন।

ভারতবর্ষে এসে গোড়াপত্তন করেন কলকাতায়। ভারত তখন ব্রিটিশের অধীনে। শাসকদলের সঙ্গে বোঝাপড়া করে গলস্টোন পরিবার সারা ভারতবর্ষে ঘোড়া ছোটাত। ঘোড়া বেচাকেনা ও রেসের মাঠ থেকে সেই যুগে লক্ষ লক্ষ টাকা রোজগার করেছিলেন জে. সি. গলস্টোনের বাবা সিনিয়র গলস্টোন। কলকাতায় পাকাপাকিভাবে বসবাসের জন্য পার্ক স্ট্রীট ও রাসেল স্ট্রীটের সংযোগস্থলে কয়েক বিঘা জমির ওপর বিশাল প্রাসাদ বানিয়েছিলেন সিনিয়র গলস্টোন। সেই প্রাসাদ আজও ঐতিহাসিক তাৎপর্য বহন করে আসছে। সে যুগে ওই প্রাসাদের নাম ছিল 'গলস্টোন ম্যানসন'। আজ আমরা সেই প্রাসাদকে 'কুইন্স ম্যানসন' নামে চিনি। 'গলস্টোন ম্যানসন'-এর চত্বরে কয়েকশো গাড়ি পার্ক করার ব্যবস্থা আজও বিদ্যমান।

বিপরীত বিহারের শেষে দুবার পরমা
'লিউয়েনস্কি' পদ্ধতিতে পুরুষাঙ্গকে সঙ্গমের উপযুক্ত করে দিয়েছে

অত বিশাল রাজপ্রাসাদোপম ইমারত কলকাতায় কটা আছে, আমার জানা নেই।

সিনিয়র গলস্টোন মারা যাবার পর জে. সি. গলস্টোন ব্যবসা চালানোর দায়িত্ব নেয়। ভাইপো ম্যাক গলস্টোন ছিল দক্ষ হর্সট্রেনার। পারিবারিক সূত্রে গলস্টোন পরিবারের বংশধরেরাও ঘোড়ার ব্যবসায় নামে। কিন্তু জে. সি. গলস্টোনের শেষ জীবনটা কেটেছিল বিপর্যয়ে, দারিদ্রে আর দুর্দশায়।

জে. সি. গলস্টোন যৌবনে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গেই বাবার সহযোগী হিসেবে ব্যবসায় নামে। অপর্যাপ্ত টাকা, সম্পত্তি, মদ আর মেয়েমানুষ সর্বদা ঘিরে থাকত তাকে। সেই সময় থেকেই গলস্টোন রেস খেলার ভয়াবহ নেশায় মেতে ওঠে।

রেসের মাঠ কাউকে ফিরে যেতে দেয় না। তার সর্বগ্রাসী থাবা থেকে রেহাই পায় না কেউ। কত লক্ষ লক্ষ পাউন্ডার রেসের মাঠে সর্বহারা হয়ে গিয়েছে তার কোনও হিসেব নেই। রেসের মাঠ যার পকেট কাটে তার পকেটে আর কোনও দিন সেলাই পড়ে না। যা-ই পকেটে রাখবে, রেসের মাঠের আগ্রাসী গহ্বর তা-ই গ্রাস করে নেবে।

গলস্টোনের একটি ঘোড়া মাঠ ছাড়তে চেয়েছিল। বোধ হয় বীতশ্রদ্ধ হয়ে সে দৌড় ছাড়তে চেয়েছিল। আমার মনে হয়, সেই ঘোড়াটা আসলে ছিল বড় দার্শনিক। সে দেখেছে, একটি মানুষ তার পিঠে চেপে দৌড় করায়—তার সঙ্গে পিঠে মানুষ নিয়ে দৌড়চ্ছে আরও কিছু তার স্বজাতি আর গ্যালারিতে হাজার হাজার মানুষ উল্লাসে চিৎকার চেঁচামেচি করছে। এসব তার ভালো লাগেনি। সত্যি বলতে কি, প্যাডক থেকে পিঠে মানুষ নিয়ে স্টার্টিং পয়েন্টের দিকে যাবার সময়ই তার মেজাজ খারাপ হয়ে যেত। অনেক কাঠ-খড় পুড়িয়ে তাকে খাঁচায় ঢোকাতে হত। তারপরেই দৌড়ও।

সেকালে কলকাতার মাঠ ফেন্সিং দিয়ে ঘেরা ছিল না। তিনফুট উঁচু কাঠের খুঁটির ওপরে কাঠের তক্তা পেতে ঘেরা থাকত মাঠ। একটা রেসের

দিন গলস্টোনের সেই ঘোড়াটি প্যাডক থেকে বেরিয়ে পিঠে জকি নিয়ে স্টার্টিং পয়েন্টের দিকে এগুচ্ছিল। হঠাৎ আচমকা একটা জার্ক দিয়ে সে পিঠ থেকে জকিকে ফেলে দিয়ে দে-দৌড়। তিন ফুট উঁচু প্রতিরোধ টপকে সে মাঠের বাইরে চলে যায়। মুক্তির আনন্দে সে লাগামহীন দৌড় শুরু করে অনির্দিষ্ট গন্তব্যের দিকে।

থিয়েটার রোড ক্যামাক স্ট্রীট ক্রসিং-এর পশ্চিমে থিয়েটার রোডের ডান ফুটে 'লালু'-র বিলিতি মদের দোকান। তার উল্টোদিকে একটা বৃদ্ধাদের আশ্রম। সেই আশ্রমে ঢুকে পড়ে ঘোড়াটি। তাকে দেখে বৃদ্ধারা কপালে হাত ঠেকিয়ে, বুকে ক্রশ এঁকে ঈশ্বরকে স্মরণ করে কৃতজ্ঞতা জানায়। তাদের কাছে ব্যাপারটা কাকতালীয়। দিন কয়েক আগে তাদের ছ্যাক্‌ড়া গাড়ি টানার ঘোড়াটি মারা যায়। ফলে, তাদের বাইরে বেরুনোর প্রয়োজনে ছ্যাক্‌ড়া গাড়িটা অচল হয়ে পড়ে। তাদের একটি ঘোড়ার বড়ই প্রয়োজন ছিল। বৃদ্ধারা মনে করল, তাদের প্রয়োজনের ব্যাপারটা উপলব্ধি করে স্বয়ং ঈশ্বর তাদের কাছে ওই ঘোড়াটিকে পাঠিয়ে দিয়েছেন। অতএব ছ্যাক্‌ড়া গাড়িটা আবার সচল হবে ওই ঘোড়াটির সহায়তায়।

আসলে বৃদ্ধাদের আশ্রমের পাশ দিয়ে যাবার সময় ঘোড়াটা গন্ধ পায় মৃত ঘোড়াটার। সেই কারণেই সে ওখানে ঢুকে পড়ে।

এদিকে গলস্টোন লোকজন নিয়ে বেরিয়ে পড়েছে ঘোড়াটির সন্ধানে। জিজ্ঞাসাবাদ করতে করতে সে অদৃশ্য ঘোড়ার পশ্চাদ্ধাবন শুরু করে। খোঁজ করতে করতে এক সময় সে বৃদ্ধাদের আশ্রমে এসে উপস্থিত হয়। বৃদ্ধারা তখন ক্লান্ত ঘোড়াটির আহারের ব্যবস্থা করে তার যত্ন আত্তি শুরু করে দিয়েছে। গলস্টোন জানায়, ঘোড়াটি তার—রেসের মাঠ থেকে পালিয়ে এসেছে। বৃদ্ধারা তার দাবি মানতে নারাজ। তারা ঘোড়া ফেরৎ দিতে অস্বীকার করে। তারা জানায়—তাদের ছ্যাক্‌ড়া গাড়ির ঘোড়াটি সদ্য মারা যাওয়ায় কী বিপাকেই না পড়েছে তারা। তাদের বিশ্বাস, ভগবান স্বয়ং ঘোড়াটিকে পাঠিয়েছেন তাদের আশ্রমে।

গলস্টোন বৃদ্ধাদের সমস্যার ব্যাপারটি উপলব্ধি করে। মানুষ হিসেবেও সে ছিল যথেষ্ট দরদী। সে তখন বৃদ্ধাদের কথা দেয়—গাড়ি টানার জন্য একটি ঘোড়া সে কিনে দেবে। রেসের ঘোড়ার দাম অনেক অনেক বেশি। সে-ঘোড়াকে দিয়ে গাড়ি টানানো যায় না। বৃদ্ধারা তার কথা বিশ্বাস করে ঘোড়াটিকে ফেরৎ দেয়। দুদিন পরে গলস্টোন গাড়ি টানার জন্য একটি ঘোড়া উপহার দেয় বৃদ্ধাদের আশ্রমে।

অতএব রেসের ঘোড়াটি রেসের মাঠ থেকে অব্যাহতি পেল না। যতদিন সে ছুটতে পারবে ততদিন তার মুক্তি নেই। বয়স হয়ে গেলে তখন হয়তো স্টাডে জায়গা পাবে অথবা মাউন্টেড পুলিশকে পিঠে চাপিয়ে ডিউটি করবে।

গলস্টোন বৈভব আর ভোগের শীর্ষচূড়ায় জীবন কাটায়। কিন্তু রেসের বীভৎস নেশা তাকে শীর্ষচূড়া থেকে আছড়ে নামায় মাটিতে। দেনার দায়ে তার পথে বসার উপক্রম হয়। একটি একটি করে সম্পত্তি বিক্রি করে সে দেনা শোধ করতে থাকে। 'গলস্টোন ম্যানসন' তখনই তার হাতছাড়া হয়ে যায়। কালীঘাট পার্কের পাশে একটি বাড়ি সে তদানিন্তন বুকমেকার শ্যাম সাহাকে দান করে তার দেনা শোধ করে। শেষ জীবনে দারিদ্রের পীড়া তাকে প্রায় পথের ভিখিরি করে ছেড়েছিল। কিন্তু জীবদ্দশায় সে সমস্ত দেনা শোধ করে মাথা উঁচু করে বিদায় নিয়েছিল এই পৃথিবী থেকে।

নিজের দিকে তাকালে এখন আমার গলস্টোনের কথাই মনে পড়ে।

স্মৃতি রোমন্থন করাই এখন আমার একমাত্র কাজ। সর্বগ্রাসী রেস আমার সর্বস্ব ছিনিয়ে নিয়েছে। তিন নারী আমার জীবন থেকে হারিয়ে যাবার পরই আমার জীবনে ঘনঘোর নেমে এসেছিল। একটার পর একটা ব্যবসা বাঁধা পড়তে থাকে। বিষয় সম্পত্তি বেচে দিতে হলো। বাড়ি গাড়ি নগদ যা ছিল—একটু একটু করে সমস্ত ঢুকে গেল রেসের মাঠে। আজ আমি সর্বহারা।

বালিগঞ্জ প্লেসের বাড়িটা বিক্রি করেছিলাম একটা শর্তে। তার জন্যে প্রাপ্য দামের চেয়ে পেয়েছিলাম অনেক কম। শর্ত ছিল—যতদিন বাঁচব ততদিন আউট হাউসের একটা ঘর আমার অধিকারে থাকবে। আর ক্ষুণ্নিবৃত্তির জন্য প্রতিমাসে আমাকে দুহাজার টাকা দিতে হবে। হিয়া আর পিয়া—আমার দুই বউ কবে কোথায় হারিয়ে গিয়েছে আমি জানি না। আঠারোটা লরি কবে কীভাবে আমার হাতছাড়া হয়ে গিয়েছে আমার জানা নেই। এতদিনে ইভিনাও নিশ্চয়ই বুড়িয়ে গিয়েছে। আমাকে দেখলে ও চিনতেও পারবে না। ভিখিরি এবং পাগলের মিশ্র কলেবর তড়িৎ সিন্‌হা ওরফে তড়িৎ স্মিথ্‌কে দেখলে এখন আর কেউই চিনতে পারবে না।

ছেঁড়া ময়লা হাফশার্ট আর পায়জামা পরা দীন-দরিদ্র একটা মানুষের পায়ে টায়ারের তাপ্পিমারা চটি। রেসের মাঠে এখনও তাকে দেখা যায়। মাসের প্রথমে প্রাপ্য দুহাজার টাকা নিমেষেই কেড়ে নেয় রেসের মাঠ। হাত পেতে ভিক্ষে নিতে হয় তাকে। তবে, পান্টারদের দয়ালু বলতেই হবে। ভিক্ষের পয়সাতেই তো প্রায় পাঁচ বছর বেঁচে আছি আমি। রেসের মাঠের হাতছানি আজও সর্বশক্তি দিয়েও আমি উপেক্ষা করতে পারি না। মাঠে ঢুকতে আমার পয়সা লাগে না। বুকমেকার্স রিং-এ অথবা গ্যালারির বেঞ্চে টান টান শুয়ে থাকি। কেউ বিরক্ত করে না।

নন্দিতার অভিশাপেই কি আমার এমন দশা হল! নন্দিতা, তুমি আমাকে টেনে নাও তোমার কাছে। এ অসহ্য জীবন আর কতদিন টানা যায়! নন্দিতা, আমি বিশ্বাস করি, মৃত্যুর চেয়ে বড় শান্তি আর কোথাও নেই। তুমি সেই মহাশান্তিতেই আছো। তোমার শান্তির ভাগ আমি কবে পাব, নন্দিতা!

শব্দসূত্র

বইতে বেশ কিছু শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, যা অনেক সাধারণ পাঠক-পাঠিকাদের কাছে পরিচিত নয়। সেই শব্দগুলির সম্ভাব্য সূত্র এখানে দেওয়া হল। ফলে, পাঠক-পাঠিকাদের বুঝতে সুবিধা হবে।

জকি	ঃ রেসের ঘোড়ার চালক
স্যাড্‌ল	ঃ ঘোড়ার পিঠে যার ওপরে জকি বসে
হ্যান্ডিক্যাপ	ঃ ওজনের তারতম্যতা
ওয়ে-ইন-রুম	ঃ রেসের আগে ও পরে জকি, স্যাড্‌ল এবং হ্যান্ডিক্যাপের প্লেট সহ যেখানে ওজন করা হয়
ডারবী	ঃ চার বছরের সেরা ঘোড়াদের নিয়ে যে অন্যতম সেরা রেস হয়
ইন্টার স্টেট বেটিং অপারেশন	ঃ মুম্বাই, ব্যাঙ্গালোর, চেন্নাই, হায়দেরাবাদ, মহীশূর, পুনে এবং উটাকামান্ড-এর রেস কলকাতার মাঠে রিলে করে শোনানো হয় এবং ঐ সব রেসে খেলা যায়
আর. সি. টি. সি.	ঃ রয়্যাল ক্যালকাটা ট্রার্ফ ক্লাব
জ্যাকপট পুল	ঃ দিনের রেসে ক্লাব অনুমোদিত নির্দিষ্ট করা পরপর পাঁচটি বাজীতে জয়ী ঘোড়ার মিলিত নাম জ্যাকপট
টানালা	ঃ প্রতি বাজীর প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় একত্রে নাম টানালা

কুইনেলা ঃ প্রথম ও দ্বিতীয় স্থানাধিকারী দুটি ঘোড়ার বাজীকে কুইনেলা বলে

সুয়ার্ড ঃ রেস পরিচালনা করার বিচারক

স্টুয়ার্ডস্

এনকোয়্যারী ঃ রেস চলাকালীন স্টুয়ার্ড সারা ট্র্যাক লক্ষ্য করতে করতে আসেন। তিনি যদি দেখেন কোনওরকম অনিয়ম ঘটেছে এবং যদি ওয়ে-ইন- রুমে নির্ধারিত ওজনের হেরফের ঘটে তবে তা এনকোয়্যারী করে তার বিধান দেওয়া হয়।

কোল্ট ঃ মদ্দা ঘোড়া

ফিলি ঃ মাদী ঘোড়া

পান্টার ঃ যারা রেস খেলে

প্যাডক ঃ রেস শুরুর আগে যে ছোট্ট মাঠে ঘোড়াগুলোকে প্রদর্শন করা হয়

ট্রেনার ঃ রেসে দৌড়নোর উপযুক্ত করে ঘোড়াকে যিনি ট্রেনিং দিয়ে তৈরী করেন

ক্যারেডওভার ঃ জ্যাকপট বাজীতে জয়ী ঘোড়া মেলাতে না পারলে সমগ্র টাকাটা পরের দিনের জন্য সরিয়ে রাখা হয়। একেই বলে ক্যারডওভার।

লেংথ ঃ একটি ঘোড়ার ঘাড় থেকে লেজ পর্যন্ত দৈর্ঘ্য।

বুকমেকার ঃ সরকার অনুমোদিত রেস খেলার সংস্থা

ইভ্ন মানি ঃ বুকমেকার প্রত্যেক ঘোড়ার জেতার দর দেয়। এক টাকার বাজীতে এক টাকা দর হলে তাকে ইভ্ন মানি বলে

প্যারালাল ডিসট্যান্স ঃ খাঁচা থেকে ঘোড়ার দৌড় শুরু হবার পর একটি নির্দিষ্ট দূরত্ব পর্যন্ত কোনও ঘোড়া লেন বদলাতে পারে না। এই দূরত্বটিকেই বলা হয় প্যারালাল ডিসট্যান্স

স্টাড ঃ ঘোড়ার জন্ম থেকে প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

ডিসট্যান্ট পোস্ট ঃ শেষ দুশো মিটার দূরত্ব

টোট ঃ ক্লাব অনুমোদিত রেস খেলার কাউন্টার

PP ঃ ফটো ফিনিশ

ওয়ার্ম আপ রেস ঃ বড় রেসের আগে অনুশীলন রেস

কোল্ট ট্রায়াল

স্টেক্স্ ঃ তিন বছরের মদ্দা ঘোড়াদের দৌড়

ব্রিডার্স ঃ যারা ঘোড়াদের প্রজোনন করায়

উইন ঃ জিৎ

আপসেট ঃ হিসেবের বাইরে জয়ী ঘোড়া

প্লেস ঃ দ্বিতীয়, তৃতীয় স্থানাধিকারী ঘোড়া

উইনিং পোস্ট ঃ জিৎ সূচক স্তম্ভ

স্টার্টিং পয়েন্ট ঃ যেখান থেকে রেস শুরু হয়

গ্যালপ ঃ ঘোড়ার দৌড়

ফাইনাল বেন্ড ঃ শেষ বাঁক